অনাদৃত উচ্ছ্বাস

(ছোটোগল্প)

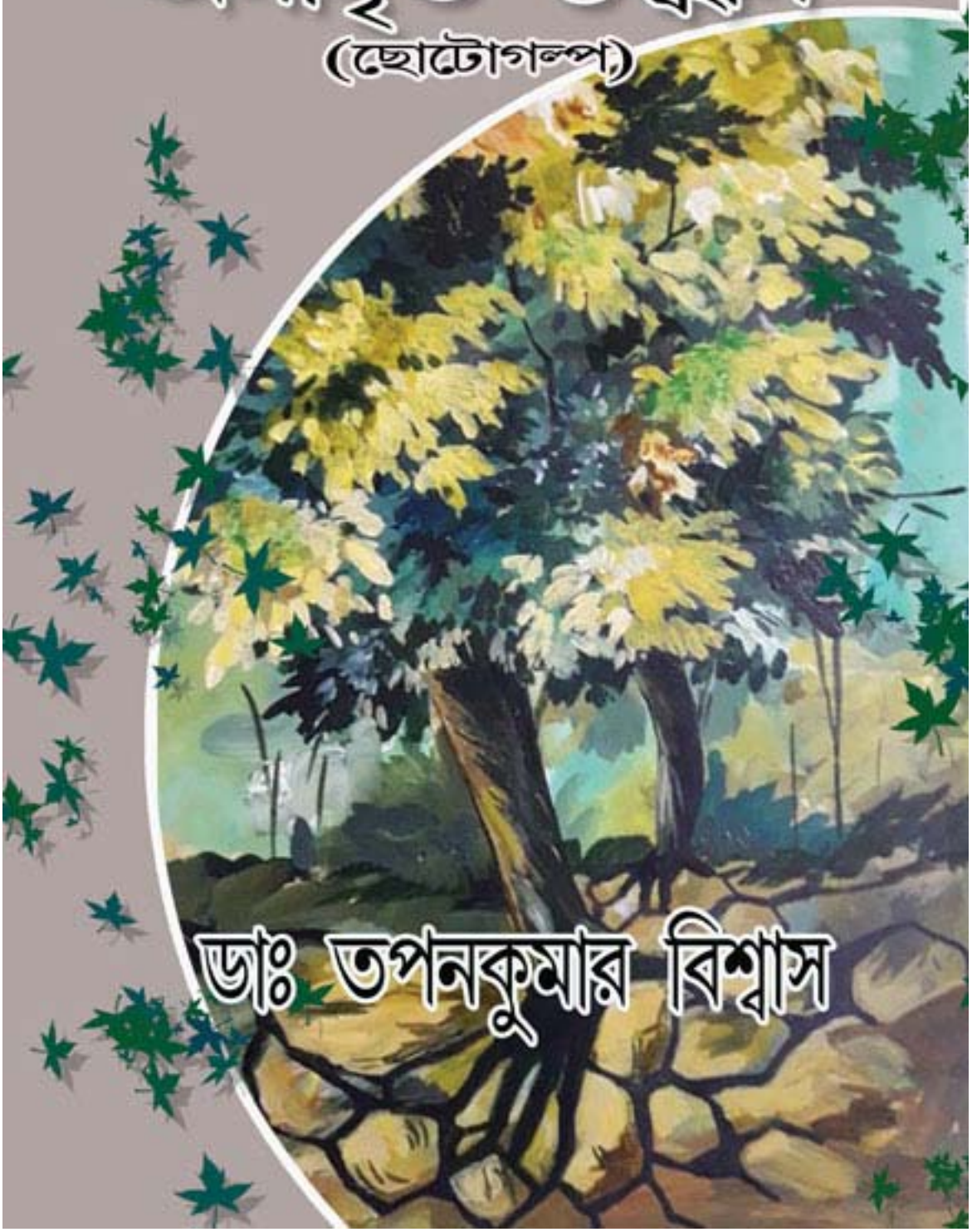

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস

অনাদৃত উচ্ছ্বাস

(ছোটোগল্প)

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

একুশশতক

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ANADRITA UCCHASH

A Collection of Bengali Small Stories

Writer : Dr. Tapan Kumar Biswas

Price : Rs 100.00

অনাদৃত উচ্ছ্বাস (ছোটোগল্প)

লেখক : ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থস্বত্ত্ব : ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা : ৭০০১২৪

প্রচ্ছদ : প্রশান্ত বসু

প্রকাশক

একুশ শতক

সুমিত্রা কুণ্ডু

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ

২৬শে অক্টোবর ২০২০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা

মুদ্রক

গীতা প্রিন্টার্স

৫১এ, ঝামাপুকুর লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN: 978-93-5493-343-1

মূল্য : ১০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ

একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩

আদি পাল ব্রাদার্স, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪

উৎসর্গ

বাবা' কে

মুখবন্ধ

বলা যায় আমার অনুরোধেই এই ছোটোগল্পের গ্রন্থখানি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যাচ্ছে। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ওকে বলছি, 'তুমি তো অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ লিখলে। মিশর নিয়ে কি সুন্দর একটা ভ্রমণকাহিনি লিখেছ। গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলন, 'আবেগ ও অন্তর' বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এবার ছোটোগল্পে হাত দাও। তোমার লেখার স্টাইলটা অন্য ধরণের। পাঠক অন্য রকম স্বাদ পাবেন।'

এবার যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তখন বুঝলাম আমার ধারনাই সঠিক প্রমানিত হতে যাচ্ছে। করোনা অতিমারির মধ্যে ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা ছোটোগল্পগুলি একেবারেই অন্য রকম। পাঠক এ গ্রন্থখানি পড়ে ভিন্ন স্বাদ পাবেন আশা করি।

চারিদিকে এখন করোনা আতঙ্ক, মৃত্যু। এই করোনা অতিমারির মধ্যে 'অনাদৃত উচ্ছ্বাস' গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আমারও বেশ আনন্দ বোধ হচ্ছে। এটা ওর নবম গ্রন্থ। সেটাও কম আনন্দের নয়। 'একুশ শতক' প্রকাশককেও একই সঙ্গে অনেক ধন্যবাদ তাদের আন্তরিকতার জন্য।

তবে শেষ কথা বলবেন পাঠক। আর তখনই সকল পরিশ্রমের সার্থকতা।

সরোজ পার্ক, বারাসাত,
কলকাতা-৭০০১২৪

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

লেখক পরিচিতি

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস এমবিবিএস, এফসিজিপি (দিল্লী)
মোবাইলঃ ৯৪৩৩১২৫১৯৫
রাজ্য সভাপতি (২০১৮-২০১৯), ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি
সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বারাসাত।
প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা
প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল
প্রাক্তন সম্পাদক, ইয়োর হেলথ, সর্বভারতীয় স্বাস্থ্যপত্রিকা-আই এম এ
আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি
আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স
প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল
প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি
প্রাক্তন সভাপতি, ব্যবসায়ি সমিতি, টাকি রোড, বারাসাত

সূচীপত্র

চিত্রকর ও মেঘবলাকা ৯
দ্বিতীয় ঢেউ ১৩
নুরুল, হিমালয় পর্বতটা কিনে রাখিস ১৫
জয়িতা ও চাবির গোছা ১৭
লক্ষণরেখায় নিখিল ২৬
একটি রিকশা ও স্বাভিমান ২৯
ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ৩৩
অক্সিজেন সিলিন্ডার ও রামু ৩৯
রাতের আগন্তুক ৪০
অনাবৃত যন্ত্রণা ৪৩
লকডাউন ৪৬
রামু ও অভ্যস্ত অধ্যায় ৪৮
ভয় ৪৯
মোহনায় অনুভব ৫২
নষ্ট পাখির গল্প ৫৪
চন্দ্রকান্ত ও প্রজাপতি ৫৬
ইন্দুমতী ও চৈতন্য ৫৭
কাত্যায়নী ৫৯
পালক, ফুল ও মাটি ৬০
নারীর অপর নাম মৃত্তিকা ৬২
স্পেস ৬৪

চিত্রকর ও মেঘবলাকা

বইয়ের শব্দরা কথা বলতে পারে না। খবর পেলাম আমাদের অনিন্দ্য সেও শব্দ হয়ে গেছে। মূলত অনিন্দ্য কথা বলতে চাইছে না কারও সঙ্গে। শব্দরা কথা বলতে চাইলেও পারবে না কথা বলতে। কথা বলার জন্যে শব্দরা খুব উদগ্রীব হয়ে ওঠে অনেক সময়—আমাদের সেই অনিন্দ্যর মতো।

আমি ঠিকমতো গুছিয়ে অনিন্দ্যকে উপস্থাপন করতে চাইলেও পারব না। আগে আমার একটা ঔদ্ধত্য ছিল—যেন আমি সব পারি। ঔদ্ধত্যই জীবনের চালিকাশক্তি। পাঠক আমাকে ভুল বুঝবেন না - আমি ঔদ্ধত্য আর অসভ্যতাকে মোটেই এক করে ফেলছি না। অসভ্যতা সে তো বাইরের বাঁদরামো, নিলামবালা ছ'আনা। আমি জানতাম অনিন্দ্যর একটা সুন্দর শক্তি ছিল, এক লহমায় যে কোনো মানুষকে ও আপন করে নিতে পারত।

কথাটা অনিন্দ্য আমাকে বলেছিল, 'জানেন, ভালোবাসতে গেলে প্রচন্ড ইচ্ছে লাগে, আর ইচ্ছেটাই সুন্দর, সুন্দরকে ঠোঁটের আগায় ধরে রাখতে হয়। সেটা আমার আছে।'

আমি হাসি লুকোতে পারিনি, 'তাই বুঝি তোমার এখনও কিছু জোটেনি?'

'যেদিন জুটবে দেখবেন আকাশ কাঁপিয়ে একটা ঝড় তুলব। আমার অন্তরটা ছুঁতে গেলে নরম একটা মন চাই, মখমলের মতো, হাঁসের পেটের মতো মেদবিহীন একটা মোলায়েম মন।'

'অনিন্দ্য, এমন রেডিমেড জিনিস কোথায় পাবে? তুমি কি শোনোনি রেডিমেড জিনিস ভালো হয় না?'

'অর্ডারি মাল বলছেন? সে তো অনেক সময় লাগে, বাগে আনতে বেগ পেতে হয়। অত ধৈর্য কোথায়?'

'তা বলেছ ঠিক। এ জন্যেই দেখ না ইউরোপে তরুণীরা বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে ডেটিংএ যেতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।'

-'ইউরোপ বলছেন কেন? এখানেও টিনএজাররা জেনে গেছে বয়স্ক পুরুষই বেস্ট চয়েজ।'

'বিয়েতে বাবার পছন্দই সেরা পছন্দ। কিন্তু ডেটিংএ ওল্ড ইজ গোল্ড।'

'হ্যাঁ, শেখাতে শেখাতে এনার্জি শেষ। ততক্ষণে তো তার ফিরতি ট্রেন ধরার

সময় হয়ে যাবে। আকাশে চাঁদ দেখে, তারা গুনে সময় নষ্ট করতে আর কেউ রাজি নয়।'

'তুমিও তো চল্লিশ পেরোনো ব্যাচেলর। তা তোমার কোন পর্যায় চলছে শুনি? টিন এজার, সমবয়সী না সংসার বিরাগী সিনিয়র? নাকি এখনও সন্ন্যাসী?'

'সন্ন্যাসী শব্দটা বেশ গোলমেলে, বস। ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মতো মজাদার।'

'মানতে পারলাম না। ছাড়ো, তা তুমিও কি ডুবেই জল খাচ্ছ? তোমাকে কিন্তু আমি অন্তত চব্বিশ ক্যারেটের পিওর গোল্ড ভাবি।'

ক্যানভাস থেকে চোখ বা তুলি কোনোটাই না সরিয়ে বলল, 'পিওর গোল্ড বলে কিছু হয় না, বুঝলেন? কিছু একটু খাদ না মেশালে গয়না তৈরিই হবে না। চল্লিশ বছর পার করলাম। আপনাদের ভাষায় আমি নামি শিল্পী। প্রচুর ফ্যান। একটা গল্পের প্লট খুঁজছেন তো? লিখে দিন অনিন্দ্য, যাকে তোমরা ভালো মানুষ বলে জানো সেও একটা ক্যানভাস ছিঁড়েছিল এক নির্জন দুপুরে ওর ছবির ঘরের ধুলো ভরা মেঝেতে। বাড়ি ছিল ফাঁকা, বাইরে ছিল আষাঢ়। কার্নিশ থেকে দুটো শালিকপাখি বৃষ্টিতে ভিজে চুপিচুপি সব দেখেছিল।'

'তাহলে পরিণতিতে কেন পৌঁছলে না?'

'বোঝেন না, পরিণতিতে পৌঁছনো অনেক হ্যাপা। দুইপক্ষই বুঝতে শিখেছে সপ্তপদী গমনে বিস্তর ঝামেলা, তার চেয়ে দুটো পরোটা ভাঁজো, টপাটপ খেয়ে নাও আর রুমালে মুখ মুছে ফেল।'

আমার এজন্যেই অনিন্দ্যকে পছন্দ। কি সব দারুণ দারুণ কথা ছেড়ে দেয় মার্কেটে। ওর মধ্যে আধুনিকতা আর নান্দনিকতা দুটোরই এক অসাধারণ মিশ্রণ। ওকে যেদিন কেউ ভালোবাসবে তার মতো সুখী পায়রা আর কেউ হবে না।

যাই হোক পাঠকের মতো আমারও আগ্রহ বেড়ে গেল, ওই যে ক্যানভাস ছেঁড়ার কথা কি যেন বলল—আধ খাওয়া আপেলের গল্প?

'তারপর? তারপর কি হল বল। আমি তো আগ্রহী সেই সঙ্গে আমার পাঠকরাও মুখিয়ে আছে।'

'তারপর আর কি? উন্মুক্ত কাঁটালতার মতো সুলতা আমার এই চিত্রশালার মেঝেতে একঘন্টা অঝোরে ঘুমিয়েছিল, ঘরের জানলায় বৃষ্টির উঁকিঝুঁকি। আমারও যে আনন্দঘুম পায়নি তা নয়। সুলতার দিকে নজর পড়তেই ঘোর কাটিয়ে একলাফে নতুন ক্যানভাস পেতে আঁকতে শুরু করেছিলাম ওকে। এমন অসামান্য প্লট হাতছাড়া করা যায়? কত দ্রুত রং তুলি চালিয়েছি আপনি ভাবতে পারবেন না, বস। আমি জানতাম ওর ঘুম ভাঙলেই সুখ আর ক্লান্তিছোঁয়া প্রশান্তির মুখখানা আর পাব না। আমি জানতাম ঘুম ভাঙলেই ওর অবিন্যস্ত শরীরের তৃপ্তিমাখা ঘামের ফোঁটা মুছে ফেলবে। আমার ওয়াশ রুমে ঢুকে সাবান জলে শরীর ধুয়ে সুলতা তখন কেতাদুরস্ত নগরীর তাজা কদমফুল।

ঘুম ভাঙলে শুয়ে শুয়েই সুলতা অবাক চোখে আমার চিত্রকর্ম দেখতে লাগল—অবিকল অন্য এক সুলতা অপ্সরা। আমার টুলে বসেই আমি ওর দিকে ওর প্যান্ট আর টি সার্ট এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'পরে নাও এগুলো।'

আমার এগিয়ে দেওয়া প্যান্ট টি সার্ট না পরে হাতে ধরেই আমার সামনের টুলটাতে অবিকল ইভের মতো বসে বলতে থাকে, 'অপূর্ব। কি ছবি এঁকেছ অনিন্দ্য! তোমার মতো চিত্রকরের কাছে আমার আজকের নিবেদন মোটেও কোনো খেয়ালী সঙ্গীত নয়। এমন এক সৃষ্টির জন্যে হাজারটা দুপুর তোমার এ চিত্রশালার মেঝের ধুলো আমি পিঠে মাখাতে রাজি। আমার ইতালির চাকরি ছেড়ে তোমার পায়ের কাছে এভাবে পড়ে থাকতে রাজি মাসের পর মাস।'

সুলতা পরদিন ইতালির মিলানে ওর বাবার কাছে ফিরে যায়। কলকাতায় ওর মাকে দেখতে এসেছিল। ওর মা সেন্ট জেভিয়ার্স এর প্রিন্সিপাল। বছরে একবার ছুটিতে এসে মাকে দেখে যায়। আমার এখানে আসে আমার চিত্রকর্ম দেখতে।

আমাকে দুঃখ নিয়ে বলেছিল, 'জানো অনিন্দ্য, অনেক চেষ্টা করেও বাবা মাকে জুড়তে পারলাম না। আমি কিন্তু পাশা খেলায় হারতে চাই না।'

যাওয়ার সময় সুলতা ওকে বলে গেছিল, 'তোমার যত প্রদর্শনী হবে আর্ট গ্যালারিতে আমার এ ছবি প্রদর্শন করো কিন্তু বিক্রি করো না যতোই দাম উঠুক।'

কথার ফাঁকে অনিন্দ্য কেটলিতে চা বানিয়ে ফেলেছে। এক কাপ চা আর দুটো ব্রিটানিয়া বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'গত বছর দিল্লিতে সেন্ট্রাল হলের পার্কার গ্যালারিতে দাম উঠেছিল সতেরো লক্ষ। আমি বিক্রি করিনি।'

আমি বুঝতে পারছিলাম ওর কথা শেষ হয়নি। আমি নিবিষ্ট শ্রোতার মতো বসে রইলাম, ও বলে চলল, 'সুলতা আমাকে গতবছর করোনা লকডাউনের আগে বলেছিল—ইতালির মিলানে চিত্রকলার বিশেষ কদর, আলাদা মর্যাদা। আমি একটা খামারবাড়ি কিনেছি। তোমার জন্যে এই খামারবাড়িতে একটা আর্ট গ্যালারী করে দেব। তোমার বাকি জীবন এখানে ছবি এঁকে কাটিয়ে দিও। প্রতি সন্ধ্যায় আমি অফিস থেকে ফিরে তোমার আর্ট গ্যালারিতে বসব তোমার সামনে। তোমার রং তুলির কাছে সমর্পণ করব নিজেকে আর তুমি একটা করে স্বপ্নসন্ধ্যার ছবি আঁকবে।'

'আপনার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, বস। খেয়ে নিন।'—অনিন্দ্য বলল।

'তোমার কথা তো শেষ হল না।'

'জানেন তো অনেক ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি সুলতার সঙ্গে, পারিনি। গতবছর ৮ই জুলাই আমার জন্ম দিনে শেষ কথা হয়েছিল সুলতার সাথে। ও জানিয়েছিল ইতালিতে করোনার ভয়ানক দাপট। ওরাও খুব ভয়ে কাটাচ্ছে। চারদিকে মানুষ মরছে শ'য়ে শ'য়ে। ইতালির কোনো হাসপাতালে জায়গা নেই। শেষকৃত্যের জন্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক কবরে দশ বারোটা লাশ

ফেলে কোনোমতে মাটি চাপা দিচ্ছে। অনিন্দ্য, করোনা থামলেই তোমাকে নিয়ে আসব এখানে।'

'বাবা মা দুজনেই করোনায় চলে গেল। এরপর থেকে আমি একলা মানুষের এক সংসার। অপেক্ষায় দিন গুনি কবে সুলতা এসে বলবে,—'চলো চলো, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। বিকেলে মিলানের ফ্লাইট।' জানেন বস, আমার সব গোছানোই আছে। ও এসে বললেই ওর ওই ছবিটা আর আমার পাসপোর্ট নিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে যাব। আর কিছু নেব না সঙ্গে। মিলানে বসে সারাদিন ছবি আঁকব। সন্ধেয় সুলতার সাথে স্বপ্ন দেখব। আপনি কি বলেন, দারুণ কাটবে না আমার?'

বলতে বলতেই অনিন্দ্যর কথা ভারি হয়ে আসে, চোখ ছলছল করে ওঠে। তুলিটা জলের পাত্রে চুবিয়ে রেখে জানলার গ্রিল ধরে আকাশের দিকে তাকাল।

'বস, দেখুন আকাশে কত মেঘ ভাসছে। ওর একটা হয়তো আমার সুলতা।'

'কেন এ কথা বলছ, অনিন্দ্য?'

'মিলানের প্যারিসিয়া এনক্লেভে নাকি কেউ বেঁচে নেই। সুলতা আমাকে বলেছিল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। যদি আমি করোনায় মরে যাই, মেঘবলাকা হয়ে তোমার আকাশের আসেপাশে ভেসে বেড়াব। আমাকে কোথাও খুঁজতে যেও না।'

দ্বিতীয় ঢেউ

পুরুষই পথভ্রষ্ট হতে জানে—যেই না কথাটা টেবিলে ছেড়েছি রে রে করে উঠল নুপুর, 'এটা কোনো বাহাদুরি নয় বুঝলে, শুভ্রজিৎ?'

'রাগ করছ কেন? নারী তো ক্ষমা করতে শিখেই নিয়েছে।' এবার ঢোক গিলল মাধবী, নুপুর, তৃণা। কেউ ঘুরে আমার দিকে তাকাল, কেউবা তীর্যকে, কেউ বা সোজাসুজি।

বুঝলাম ক্ষমা করার মধ্যে মেয়েদের মনে একটা আত্মগরিমা কাজ করে—হ্যাঁ আমিই পারি, আমরাই পারি তোমাদের ক্ষমা করতে। মেয়েরা এজন্যে বেশ গর্ববোধ করেন।

মাধবী বলল, 'তাই বলে তোমরা বারেবারে সুযোগ নেবে আর আমরা ক্ষমার ডালি থেকে ফুল ছড়িয়ে যাব?'

'রাগ করছ কেন? নক্ষত্র পথভ্রষ্ট হয়েছিল বলেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল সূর্যের সাথে সংঘর্ষে।'

পাশ থেকে রাজন উত্তেজিত মাধবীকে ধরে বসাল। বলে উঠল, 'সবাই থামবে? আমরা এসেছি নির্মল আড্ডায়। আর সব তত্ত্বকথা শুরু করেছে।'

আমি রাজনকে বললাম, 'আমি শুরু করেছিলাম আদিরস দিয়ে। তোরা দেখলিতো মাধবী এগোতেই দিলনা। বাগড়া দেওয়ার অভ্যেসটা ওর গেলনা।'
'আচ্ছা বাবা ঘাট হয়েছে। তোরা শুরু কর। যা বলবি আজ মুখ বুজে সহ্য করব। সব শুনে যাব, মেনে নেব।'

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, 'ঠিকতো? যা খুশি?'

সাথে সাথে তৃণা বলে উঠল, 'বুঝলে শুভ্রজিৎ, সবপুরুষের মধ্যেই একটা পারভার্সান আছে। মেয়েদের শুনিয়ে ওরা নিজের খিদে মেটায়।'

ওপাশ থেকে মৃণালিনী হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'তাই হোক। আজ চুড়ান্ত পারভার্সানের গল্প হোক। আজ যে যা খুশি তাই বলতে পার, যা খুশি তাই গাইতে পার।'

মৃণালিনী গেয়ে উঠল রবীন্দ্রসংগীত, 'আজি জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' আর আমরা এ ওর গায়ে ঢলে ঢলে, সুরে সুরে কণ্ঠ মেলালাম।

মেডিকেল কলেজের সেই সময়ে এমন কত আড্ডায় হারিয়ে গেছি আমরা।

ওই আড্ডায় সবার সামনে হাসতে হাসতে নুপুর আমাকে বলেছিল, 'শুভ্রজিৎ, আমি কিন্তু তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। তুই একটা জিনিয়াস।'

আমি কোনো উত্তর দিইনি। ভাবিনি একবারও, 'ওকি সত্যিই সিরিয়াস?'

একটু থেমে আবার নির্মল হাসি, ঝগড়া খুনসুটি গানে চায়ের কাপে আর কফি তুফানে।

একটু আগে খবর পেয়েছি নুপুরের ভেন্টিলেটর এইমাত্র খুলে নিয়েছে। গত কয়েকদিন করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। ছুটে গেলাম হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের সামনে। ওর স্বামী রোহিতবাবু প্লাস্টিকে মোড়া নুপুরকে নিয়ে যাবেন শ্মশান ঘাটে।

আমাকে দেখে বললেন, 'আমি গতকাল আমেরিকা থেকে এসে পৌঁছলাম। ছেলের কাছে শুনলাম দ্বিতীয় ঢেউ আসার পর একটা দিনও ছুটি নেয়নি। টানা ডিউটি করেছে হাসপাতালে। ছেলের কোনো নিষেধ শোনেনি।'

সাতদিন আগে শনিবার সন্ধ্যায় স্ট্রেচারে শুইয়ে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে নুপুরকে বলেছিলাম, 'ভালো হয়ে যাবি নুপুর। চিন্তা করিস না।'

'তুই কোনোদিন আমার চোখের ভাষা বুঝিসনি, শুভ্রজিৎ। সাবধানে থাকিস। চললাম আমি।'

নুপুরের মধ্যে সেদিনও দেখেছিলাম পুরোনো অভিমান। ছলছল করে উঠেছিল ওর দু'চোখ।

প্লাস্টিকে মোড়া নুপুরকে নিয়ে চলল শবযান। পেছনের গাড়িতে নুপুরের ছেলে। আমি তাকিয়েই রইলাম ওদের পথের দিকে। নুপুর, তুই আর কথা বলবি না কোনোদিন?

নুরুল, হিমালয় পর্বতটা কিনে রাখিস

সরোজ হঠাৎ মাঝখানে সকলকে থামিয়ে বলল, 'শোনো বন্ধুরা, ভাঙন না হলে ভালোবাসা জমাট বাঁধে না। নদীর পাড় ভাঙলেই কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে হৃদয় মেরামত করা হয়।'

আমি না থামালে সরোজ আরও বকতো।

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমাদের সকলের প্রিয় বন্ধু পজু মিষ্টি প্রেমের উপর একটা আলোচনা করছে। তার মধ্যে তোর বাগড়া দেওয়া কি ঠিক, সরোজ?'

নুরুল আমাকে কটাক্ষ করে বলল, 'কেন, সরোজ ঠিক কথাটা বলল বলেই কি আঁতে ঘা লাগল তোর?'

পেছনে বসা কানিজ, বুলবুলি আর বাদল একসাথে হাততালি দিয়ে উঠল, 'ঠিক, একদম ঠিক। পজু জমিয়ে কথা বলতেই পারছে না। তুই বসে যা, পজু।'

আমি কানিজ-বুলবুলি-বাদল এই তিনজনের রসায়নটা কোনোদিনই বুঝতেই পারলাম না, যে কোনো ইস্যুতে ওরা তিনজন সব সময় একজোট।

এটুকু বুঝলাম যে নুরুলের দল আজ হোম ওয়ার্ক করে এসেছে। পারব না নুরুলের সাথে।

রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্যান্টিনে ছুটলাম। আমি, জপা আর অজিত চিকেন পাকোড়া, সামোসা আর কোল্ড ড্রিংকসএর বোতল নিয়ে হাজির হতেই কোথায় পালাল আলোচনার তুফান! কোথায় পালাল প্রেমের সংজ্ঞা! সব হুড়মুড়িয়ে পড়ল আমাদের প্লেটের উপর যেন কালবৈশাখী ঝড় নেমেছে।

নুরুলকে বললাম, 'দেখ, কেমন ভেস্তে দিলাম তোদের আলোচনা। আমার ব্যাটিং স্টাইলটাই আলাদা, বুঝলি?'

কাল রাতে বাদল হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপে আমেরিকা থেকে লিখেছে, 'ট্রাম্পের তিনজন অষ্টাদশী বান্ধবী ওয়াশিংটন ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে ওদের পুরোনো প্রেমিকদের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করেছে। যখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিল—এ অর্থ নাকি ওরা ট্রাম্পের থেকে হাতিয়ে নিয়ে ওদের প্রেমিকদের কাছে পাঠাত। সব নাকি ওদের প্রি-প্লান ছিল। এখন ছেলেগুলো সব অস্বীকার করেছে।'

আমি লিখলাম—'বাদল, করোনা লকডাউনে এছাড়া আর মজাদার খবর জোগাড় করতে পারলি না?'

আমি অনেক ভেবে নুরুলকে ভিডিও কলে বললাম—'তুই বন্ধু, কিছু টাকা দিয়ে হিমালয় পর্বতটা কিনে রাখিস। করোনা একদিন যাবেই যাবে। তখন আমরা কলেজের ব্যাচমেট সবাই আমাদের যত কথা হিমালয়ের গায়ে লিখে আসব।'

আমার এ কথা শুনে নুরুলের পাশে থাকা কানিজের আর হাসি থামে না।

কানিজ বলে উঠল, 'তপন, তোকে তো অনেক ব্রিলিয়ান্ট জানতাম। তুই যে এতটা নির্বোধ হয়ে গেছিস, ভাবতে পারি না।'

-'কেন, কেন? কি এমন ভুল বললাম? আমাদের সেই দিনের সব কথা লিখতে তো পুরো হিমালয়ের দেয়ালটা লাগবেই।'

এবার কানিজ গম্ভীর হয়ে ধরা গলায় বলল, 'ওরে বুদ্ধু, ওরে বন্ধু আমার, আমাদের সেদিনের সব কথা একটা হিমালয়ের দেয়ালে ধরবে না। কত সে কথা, বল তো? আর আমাদের যারা করোনা ওয়ার্ডে করোনা রোগীদের জন্যে যুদ্ধ করতে করতে চলে গেল না ফেরার দেশে, তাদের কথাও তো লিখতে হবে রে, পাগলা।'

চোখের জলে মোবাইল স্ক্রিন ভেসে যেতে যেতে ভিডিও কল ঝাপসা হয়ে আসছে।

-'কানিজ, তোর মুখটা আর দেখতে পারছি না কেন? নুরুল, কিছু বলছিস না কেন?'

জয়িতা ও চাবির গোছা

নন্দনে সিনেমা শেষে ওরা গিয়ে বসল লেকের ধারে পায়রা ওড়া বিকেলের বাতাসে। সঙ্গে এক প্যাকেট চিনা বাদাম আর আবেগঘন শকুন্তলা পরিবেশ। ঘাসের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অভিমন্যু বলল, 'জয়িতা, আমি তোমার পাগলামিতে মত্ত খয়েরি উটপাখি।'

'তুমি থাক অশান্ত বিসুভিয়াস হয়ে আমার চারপাশে। আমার ভয় হয় তুমি কবে বলে ওঠো, আমি নিত্যসন্ন্যাসী শুকতারা হতে চাই। সেদিন আমি নিঃস্ব দময়ন্তী হয়ে যাব, অভিমন্যু।'

'আমার যে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজাতে ইচ্ছে করে, জয়িতা। ইচ্ছে করে আমার বাঁশির সুরে নাচবে শত ময়ূরী, গাইবে কৃষ্ণের শত গোপী, আমার ঘুম ভাঙবে কৃষ্ণ নামে। সংসারের শেকলে আমাকে কি করে বাঁধবে তুমি?'

জয়িতা ওর তর্জনীতে অভিমন্যুর দুই ঠোঁটের ভাষা আগলে বলেছিল, 'তোমাকে ধরে রাখব আমার মাধবীলতায়, আমার ভালোবাসার চিরঞ্জীবী সুধায়। ষোলো কোটি দেবীর মধ্যরাতের তৃষ্ণা নিয়েছি আমার ঠোঁটে, চন্দ্রকলা আমার সর্বাঙ্গে। শান্ত হও তুমি।'

জয়িতা কোনোদিনের জন্যই অভিমন্যুকে চিনতে পারেনি। ও যে মহাসমুদ্রের ঢেউ—দেখা যায় না ওকে। ভালোবাসায় বন্দি হতে জানে না অভিমন্যু।

সাত দিনের ছুটি নিয়ে দেবার্ঘ্য আর জয়িতা বৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দ হোটেলে উঠেছে আজ। দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দেবার্ঘ্য ঘুরতে বেরোয় বৃন্দাবনের মন্দিরে আশ্রমে। করুণাময়ী বিধবা আশ্রম—কয়েকশো অনাথ বিধবা থাকে এখানে। সেখানে পৌঁছে জয়িতা সামনে দাঁড়ানো আশ্রমিকদের বলে সে আশ্রমের বিধবাদের জন্য কিছু দান করতে চায়। দ্বাররক্ষী জয়িতাকে আশ্রমের গর্ভগৃহে নিয়ে যায়।

'প্রভু ধ্যান করছেন'—প্রভুর জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে দ্বাররক্ষী। ধ্যান ভাঙলে পেছন থেকেই জয়িতা বলে ওঠে, 'প্রভু, আমার স্বামী আর আমি আপনার আশ্রমে বিধবাদের জন্য কিছু দান করতে চাই।'

ঘুরে বসে জয়িতার চোখে চোখ রাখতেই প্রভুর মধ্যে এ কোন চিত্তচাঞ্চল্য! সম্বিতে ফিরে আসেন পরক্ষণে। সৌম্য কান্তি প্রভু শান্ত কণ্ঠে বলেন, 'আসন গ্রহণ করুন আপনারা।'

জয়িতার সমগ্র শরীর কেঁপে উঠল প্রভুর আদেশে। শশ্রুমন্ডিত পাগড়ি পরিহিত প্রভুর চোখে তার চিরচেনা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি।

দশ হাজার টাকার একটি চেক লিখে প্রভুর হাতে দিয়ে ওরা ফিরে আসে হোটেলে। রাতের খাবার না খেয়েই শুয়ে পড়ে জয়িতা। ঘুম হয় না সারারাত। খুব ভোরে উঠে অভিমন্যুকে কিছু না বলেই জয়িতা বেরিয়ে যায়। পৌঁছে যায় করুণাময়ী বিধবা আশ্রমে। বিশাল দরজা ঠেলে ভেতরে যেতে চায় সে।

দ্বাররক্ষী বলে, 'সূর্য ওঠার আগে বাইরের কোনো মহিলার ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই।' চঞ্চলা জয়িতা। তার যে দেরি সহ্য হচ্ছে না আজ। এত অস্থিরতা কেন তার!

প্রভুর চিত্তে আজ এ কোন ফল্গুধারা। অনেক ভোরে ঘুম ভেঙেছে প্রভুর। নিজের পুষ্পবনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। দূরে সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রমনীকে দেখেই চিনতে পারেন আশ্রমের সর্বাধিকারী। দ্বাররক্ষীকে ইশারায় রমনীকে পুষ্পবনে নিয়ে আসতে বলেন।

সান বাঁধানো আসনে মুখোমুখি বসেন দুজনে । অঝোরে কাঁদতে থাকে জয়িতা। তার চোখের জলে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্রোত। বুক ভেসে যায় আনন্দধারায়, বৃন্দাবনের বাতাসে কৃষ্ণনামের ঢেউ ওঠে, পুষ্পবনের সব ফুল আনন্দে ঝরে পড়তে থাকে মাটিতে।

'অভিমন্যু, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। অনেক খুঁজেছি তোমাকে। অনেক সৌভাগ্য সন্ধানে তোমাকে পেয়েছি। আমি আর ফিরে যাব না।'

'আমার দ্বারা সংসার হবে না, জয়িতা।'

'তুমি পালিয়ে এসেছিলে কেন, অভিমন্যু?'

'সংসারের বাঁধন বড়োই কঠিন। একবার জড়ালে ছিন্ন করতে পারব না।'

'সবই তো তোমাকে দিয়েছিলাম। তবু কেন পালালে? বৃন্দাবনের সাধনা চোখে মেখে খুঁজেছি তোমাকে।'

'পুরুষ মন সোনার গৌরের মতো অস্থির। নারী শরীরের ভজনা সোনার গৌরকে আটকে রাখতে পারে না কোনোদিন। ফিরে যাও, জয়িতা। আমি সহস্র জননী পেয়েছি আমার আশ্রমে। এখানেই আমার পূর্ণতা। এখানে শুধু অনাথ বিধবাদের স্থান।'

'স্বামী মারা গেলেই কি শুধু সে বিধবা? আমার সংসারে স্থিতি নেই, মন নেই, অভিমন্যু। মিনতি করি আমাকে তোমার পায়ের নিচে একটু জায়গা দাও। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই তোমার কাছে।'

-'তা হয় না জয়িতা। ফিরে যাও। কর্তব্য কর। সংসারে মন দাও।'

বিধবা আশ্রমের সিংহদরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ দেবার্ঘ্য। দূর থেকে দেখতে পায় পুস্পবনে প্রভুর একান্তে ঘনিষ্ঠ জয়িতা। দেবার্ঘ্যর ডাকে পেছন ফেরে জয়িতা, 'জয়িতা, তুমি এখানে? তোমাকে খুঁজছি আমি। এসো। বাইরে চলে এসো।'

যাওয়ার আগে বলে যায়, 'আমি আবার আসব কোনো এক লীলাতিথিতে, সেখানে আমি তোমাকে পাবই পাব। সেবার আসব একা। তুমি আমার জীবনের একমাত্র আরাধনা।'

জয়িতার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে যায় দেবার্ঘ্য। কোনও প্রশ্ন করল না দেবার্ঘ্য—কেন এসেছ? কখন এসেছ?

কোনো কথা হয় না দুজনের। হোটেলে ফিরে গুছিয়ে নেয় সবকিছু। এদিনই দিল্লি হয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে কলকাতা ফেরে ওরা।

জয়িতা-দেবার্ঘ্য দুই বছর হল বিয়ে হয়েছে। ওরা দুজনেই ভালো চাকরি করে। জয়িতা অ্যাপোলো হাসপাতালে সি ই ও। দেবার্ঘ্য সেক্টর ফাইভে টেলকো কোম্পানির প্রোজেক্ট ম্যানেজার। কোনো ছেলেপুলে হয়নি ওদের। নানান অজুহাতে নিতে চায় না জয়িতা। অসমাপ্ত রেখেছে প্রতিরাত। প্রতিরাতে প্রতিবারেই চূড়ান্ত পর্বের পূর্বে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে জয়িতা। অতৃপ্ত থেকেছে দেবার্ঘ্যর প্রতিটি নৈপুণ্য।

জয়িতা বেশি ব্যস্ত থেকেছে ওর প্রফেশন নিয়ে। সংসার নিয়ে বরাবর উদাসীন উন্মনা ও। দেবার্ঘ্য কারণ জানতে চেয়েছে, জানতে পারেনি। এরপর ওরা ডুবে থেকেছে কাজের, ভুবনে যার যার নিজের জগতে।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে আরও শীতল হয়েছে ওদের সম্পর্ক। খুব কম কথা হয়— প্রয়োজনের যে টুকু তাই। হ্যাঁ, না, আচ্ছা, এর মধ্যেই থেকেছে সীমাবদ্ধ।

আজ কি হয়েছে জয়িতার! অফিস থেকে ফিরেই বাথরুম ঢুকেছে। শাওয়ার-জেল ঢেলে দেয় জলভর্তি বাথটবে। অফিস থেকে ফেরার সময় অ্যাপোলোর সামনে দাঁড়ানো ছেলেটার থেকে একতোড়া গোলাপ কিনেছিল। সবগুলো গোলাপ ছিঁড়ে কয়েক'শো পাপড়ি ভাসিয়ে দেয় জলের উপর। অফিসের পোশাক থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করে নিজেকে। গোলাপ জলের আলিঙ্গনে সমর্পণ করল ধীরে ধীরে। ও যেন এক মৎস্য কন্যা, গোলাপের পাপড়িরা ওর শরীর ছুঁতে কাছে আসে ভেসে ভেসে। বাথটবে জলের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল গোলাপ সান্নিধ্যে আজ অন্য রকম অনুভূতি জয়িতার। জলের বাইরে আসতে মন চাইছে না তার। প্রতিটি গোলাপের পাপড়িতে যেন অভিমন্যুর গায়ের পুরুষ গন্ধ, দুই বছর আগের চেনা গন্ধ। কেন এমন হচ্ছে তার! বাথটবের জল আঁকড়ে ধরেছে তার শরীর। বাঁধন ছেড়ে বেরোতে পারছে না সে। ঢেউ উঠেছে জলে। ঢেউ উঠেছে রক্তে। বাথটবের জলে তরঙ্গ, গোলাপ পাপড়ি ক্রমেই দ্রুত লয়ের ছন্দ ও গতিতে জয়িতাকে সঙ্গত দেয়। শরীরটা ওর এক পিয়ানো, নিজেই হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য পিয়ানো বাদক। এ কোন সুর, এ কোন তাল, এ কোন সঞ্জীবনী তরঙ্গ!

একসময়ে শান্ত হয় সমুদ্র তরঙ্গ। শান্ত হয় জয়িতা। টাওয়েল রড থেকে তোয়ালেটা কোনোক্রমে টেনে নিয়ে গায়ে পেঁচিয়ে ঘরে এসে মেঝেতে এলিয়ে পড়ে সে। শরীরটাকে তুলে বিছানায় নিয়ে উঠে যেতে পারে না, ভয় হয় যদি হারিয়ে যায় রেশটুকু। কতক্ষণ এ ভাবে পড়ে ছিল জানে না জয়িতা।

রাতে একসাথে বরাবরের মতোই ডিনার করল দেবার্ঘ্যর সাথে।

নতুন একটা লাল শাড়ি পরেছে। শুতে যাওয়ার আগে জয়িতা কপালে লাল টিপ পরেছে, সুগন্ধি মেখেছে শরীরে। রাতে জয়িতা দেবার্ঘ্যকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আজ সারারাত আমরা ঘুমোবো না।'

দেবার্ঘ্য জয়িতার কোনো কথায়ই বিতর্কে জড়ায় না। বলল, 'ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছে।'

জয়িতার এমন রূপ, এমন আচরণ আগে কখনো দেখেনি দেবার্ঘ্য, অবাক হয়েও হারিয়ে যায় দুজনে রাতের উত্তাল শাসনে। জয়িতা ভরিয়ে দেয় ভালোবাসায়, নিজেকে উজাড় করে দেয় উচ্ছল রমণীর ষোলো কলায়।

রাতজাগা পাখিরা চিৎকারে শিৎকারে নিজেরাও ডানা ঝাপটায়। স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসে মেনকা রম্ভা উর্বসী।

অবাক হয় দেবার্ঘ্য, বিভোর হয়ে আকণ্ঠ ডুবে যায় জয়িতার মিথুন শ্রাবণে। শেষ রাতের দিকে শরীরের উত্তাপ প্রশমিত হলে ক্লান্তিতে কখন গভীর ঘুমে হারিয়ে যায় দেবার্ঘ্য।

খুব ভোরে পাশ থেকে উঠে জয়িতা হাতের বালা, গলার হার, আজ রাতের স্মৃতিমাখা শাড়িখানা খুলে গুছিয়ে রাখে বিছানায়। পরে নেয় একটা সাদা থান, নিশ্চুপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—কিছুই বুঝতে পারেনি, জানতে পারেনি দেবার্ঘ্য।

মোবাইল সুইচড অফ। দেবার্ঘ্য ভেবে পায় না রহস্য। সারা রাত এমন ভাসিয়ে দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে কেন কিছু না জানিয়ে জয়িতা কোথায় চলে গেল? সারাদিন খুঁজে কোথাও না পেয়ে থানায় মিসিং ডায়েরি করেছিল।

অনেক অনেক দিন পর একটা ছবি আসে ওর হোয়াটসআপে অপরিচিত নম্বর থেকে, সাদা থান পরে আছে জয়িতা, অনেক বিধবার মাঝে দাঁড়িয়ে। নিচে লেখা আছে, 'ক্ষমা করে দিও। এখন সহস্র জননী আমার সন্তান।' ওই নম্বরে বারবার ফোন করে কোনো সাড়া পায় না সে।

পরদিনই ভোরের ফ্লাইট ধরে দেবার্ঘ্য। দিল্লি হয়ে আগ্রার পথে ছুটে যায় বৃন্দাবনের করুণাময়ী বিধবা আশ্রমে। প্রভুর পায়ে মিনতি করে, 'আমার জয়িতাকে ফিরিয়ে দিন, প্রভু। ওকে আমি ভালোবাসি।'

প্রভু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে দেবার্ঘ্যর দিকে। দেবার্ঘ্যকে বলেন, 'আমি জানতাম জয়িতা তোমার কাছে থাকবে না। এটাও জানতাম সে আমার কাছেও থাকবে না। আমার আশ্রমে সে আসেনি।'

'তা হলে? জয়িতা আর কোথায় যাবে!'

'দেখ, পৃথিবীতে একটিও দুঃখী মানুষ নেই। সুখ সে খুঁজে নেবেই, ঘর সে পাবেই। পৃথিবী এক মস্ত বড়ো শান্তির ধাম।'

দেবার্ঘ্য বৃন্দাবনেই রাধা-কৃষ্ণ হোটেলে থেকে রোজ খুঁজে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায় উদ্ভ্রান্তের মতো—কোথায় তুমি জয়িতা?

বৃন্দাবনের আশ্রমে আশ্রমে দেবার্ঘ্য খুঁজে ফেরে জয়িতাকে। এরই মধ্যে ওর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে—সকালে একবার এসে বাবার নাটমন্দিরের সিঁড়িতে বসবে। তারপর বিভিন্ন মন্দিরে আশ্রমে খুঁজে বেড়ায় ওর জয়িতাকে। আজও এসে বসেছে সিঁড়িতে। মন্দাকিনী শালপাতায় ভোরের পুজোর প্রসাদ এনে দেবার্ঘ্যর হাতে দিয়ে খিলখিল হেসে বলে, 'অনেকক্ষণ এসেছ, পুরুষ?'

'এই তো এখনি এলাম।'

'আচ্ছা মন্দাকিনী, একটা কথা বলবে? তোমার যৌবন আছে, এখনো বয়স আছে। সংসার না করে তুমি কেন এখানে এই পরিবেশে?'

'সে অনেক কথা। সে সব শুনে কি করবে তুমি?'

'না তুমি বল । আমি শুনব। শুনতে চাই তোমার কথা।'

'গত বছর মাঘের অমাবস্যার রাতে ঘর ছেড়েছি। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে ফণীমাসির হাত ধরে চলে এলাম বৃন্দাবনে। এই মন্দিরে বাবার পায়ে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল ফণীমাসি। এখানে বাবার দিনরাত্তির সেবাযত্ন—বিনিময়ে দুবেলা খাওয়া, বছরে দুটো সাদা থান। ভালো আছি। আর ফিরে যাইনি গো, পুরুষ। কেন আমার দিকে তোমার নজর পড়েছে বুঝি?'

'না তা ঠিক নয়। তবে তোমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে।'

'এ তো পুরুষ মানুষের স্বভাব গো। সোমত্ত মেয়েছেলে দেখলেই কথা বলতে ইচ্ছে করে তোমাদের। তোমারও কি তাই? না কি আরও কিছু?'

'জানি না। তবে ভোর হলেই তোমার নাটমন্দিরে মন টানে।'

'নাটমন্দিরে তোমার মন টানে। কেন আমার জন্যে মন টানে না?'

'সেই টানেই যে ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে। ছুটে আসি তোমার নাটমন্দিরের সিঁড়িতে।'

চোখের জল গোপন করে মন্দাকিনী দেবার্ঘ্যর হাতটি ধরে সিঁড়িতে বসিয়ে বলে, 'ও পুরুষ, কারে খোঁজো তুমি? মনের মানুষ? বৃন্দাবনে বেশিদিন থাকলে প্রেমে পড়ে যাবে গো। ঘরে ফিরতে মন চাইবে না। আমিও যে জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছি প্রতিদিন—তোমাকে দেখতে মনটা কেমন করে গো।'

-'সত্যি বলছ, মন্দাকিনী?'

মন্দাকিনী হাত ছাড়িয়ে নেয় দেবার্ঘ্যর হাত থেকে।

-'ভালোবাসতে হলে মেয়েছেলের যত্ন করতে হয়। পারবে যত্ন করতে?' এ কথা বলে এক দৌড়ে মন্দিরের ভেতরে ছুটে গেল মন্দাকিনী। বাবার ঘরের পাশেই নিজের ছোটো ঘরের শেকল তুলে আছড়ে পড়ল বিছানায়। সেদিন বৃন্দাবনের বাতাসে অনেকেই কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না। সারাদিন না খেয়ে বন্ধ ঘরে মন্দাকিনী পড়ে থাকে। কেউ খোঁজ নেয়নি। অভাগী মন্দাকিনীর ব্যথায় ভাসে বৃন্দাবনের মাটি।

অনেক রাতে পুজোপাঠ সেরে বাবা মন্দাকিনীর ঘরে আসেন। ওর খাটে বসেন। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ওর খোলা পিঠে হাত রাখেন বাবা। মন্দাকিনী আজ সাড়া দেয় না বাবার স্পর্শে। পড়ে থাকে নিস্তেজ সাপিনীর মতো। সারাদিনের অভুক্ত দুর্বল মন্দাকিনীর স্পন্দন নেই শরীরে। মন্দাকিনীর নিস্তরঙ্গ দেহেই তর্পণ সমাপ্ত করেন বাবা। অনেক রাতে বাবা ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। গামছায় গায়ের ঘাম মুছে ত্রিফলা ভেজানো এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করেন। এরপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

মন্দাকিনী প্রসাদ সাজিয়ে বাবার ঘরে আসে রোজ সকালে। আজ আসেনি। নিজের ঘর থেকেই বাবা ডাকেন মন্দাকিনীকে, 'মন্দাকিনী, মন্দাকিনী।'

মন্দাকিনীর কোনো সাড়া পান না। ছুটে যান ওর ঘরে। গিয়ে দেখেন ফাঁকা ঘর, বাইরের দিকের দরজা খোলা। এক ফালি সূর্যের আলো পড়েছে ওর বিছানায়। মন্দাকিনী কোথায় গেল? সমস্ত বৃন্দাবন খুঁজে দুপুরে ক্লান্ত বিষণ্ণ বাবা মন্দিরে এসে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকল সেবাদাসী বাবাকে ঘিরে বোঝাল, মন্দাকিনী কলকাতার বাবুর হাত ধরে ঠিক পালিয়েছে । কলকাতার বাবুর সাথে মন্দাকিনীর মাখামাখি বৃন্দাবনের সকলেরই চোখে পড়েছে। সকলেই বলেছে, 'এ পাপ- মহাপাপ। ধর্মে সইবে না।'

তারা সকলে মিলে বলল, 'বাবা, আমরা তো আছি। আপনার সেবা যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না।'

সেদিন মন্দিরে পুজোপাঠ হল না। সেবাদাসীরা সেই সন্ধ্যায় আপন আনন্দে গলা ছেড়ে নামগান করতে লাগল আর নাচতে লাগল মন্দির ঘুরে ঘুরে।

সারা রায়পাড়ায় এখন একটাই গল্প, দেবার্ঘ্য রায় বৃন্দাবন গেছে ওর বউ খুঁজতে। আহারে, এতো সুন্দর বউ পালিয়ে গেল? দুঃখ নেই কষ্ট নেই, সংসার ছেড়ে যাবেই বা কোথায়!

পাশের বাড়ির শেফালী বউদি সকলকে অবাক করে বলতে শুরু করেছে, আজ সকালে দেবার্ঘ্য রায় বৃন্দাবন থেকে ফিরেছে। ট্যাক্সি থেকে সাদা থান পরা এক সুন্দরী যোগিনীকে নামিয়ে তার হাত ধরে ঘরে ঢুকেছে। সে নিজ চোখে দেখেছে।

অভিমন্যুকে ভালোবেসেছিল জয়িতা। অভিমন্যু একদিন তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিল বৃন্দাবনে। জয়িতার ভালোবাসার অভিমন্যু আজ বৃন্দাবনের বিধবা আশ্রমের প্রভু। জয়িতার বাবা দেবার্ঘর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। জয়িতার মন বসে না সংসারে। জয়িতা দেবার্ঘ্যকে কিছু না জানিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। অভিমন্যু তাকে আশ্রয় দেননি। জয়িতা বারাণসীর লীলাবতী বিধবা আশ্রমে অসহায় বিধবাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু কিছুতেই মন বসে না তার। তার মন পড়ে আছে বৃন্দাবনের প্রভুর আশ্রমে। অভিমন্যুর জন্যে সে সব ত্যাগ করতে রাজি।

মাঘী পূর্ণীমায় জয়িতা কিছু না জানিয়েই বৃন্দাবন পৌঁছে যায়। অভিমন্যুর বন্ধ

দরজায় বারবার আঘাত করতে থাকে। অভিমন্যু সবে শয্যা গ্রহণ করেছেন। দরজায় শব্দ শুনে উঠে দরজা খোলেন।

অবাক হয়ে বলেন, 'এই অসময়ে তুমি জয়িতা? কোথা থেকে আসলে?'

-'অভিমন্যু, আমি বারাণসী থেকে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমাকে একটু যায়গা দাও তোমার পাশে। কোথাও মন বসছে না আমার।'

-'সে হয় না, জয়িতা। তুমি শাস্ত্রমতে দেবার্ঘ্যর বিবাহিতা স্ত্রী। অধর্ম করো না। সে তোমাকে ভালোবাসে। তোমার খোঁজে সে সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি ফিরে যাও তার কাছে।'

অভিমন্যুর ঘরের মেঝেতে বাকি রাত কাটাল জয়িতা। সকালে প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বলল, 'তোমার আদেশ মেনে আমি দেবার্ঘ্যর কাছেই ফিরে যাব।'

সকালে দেবার্ঘ্য স্নানের জন্য বাথরুমে ঢুকেছে। একটা রজকিনি শাড়ি পরেছে মন্দাকিনী। ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখছে। খেয়েই অফিসে বেরোবে। ডাইনিং টেবিলে রাখা দেবার্ঘ্যর মোবাইলটা বেজে ওঠে এ সময়ে। দেবার্ঘ্যর মোবাইলের কল ধরে না মন্দাকিনী। নানান রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে নাজেহাল সে। ভালো লাগে না। অপ্রস্তুত লাগে খুব।

আবারও বেজে ওঠে মোবাইল। ভাবল হয়তো জরুরি কেউ। কলটা রিসিভ করে চুপ করে থাকে, কোনো কথা বলে না। ওপার থেকে কথা ভেসে আসে নারীকণ্ঠ, 'দেবার্ঘ্য, আমি তোমার কাছেই ফিরে আসছি প্রভুর নির্দেশে। বিধবা আশ্রমের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সামনের সপ্তাহেই পৌঁছোচ্ছি।'বলেই ফোন কেটে যায় ও প্রান্ত থেকে।

এক মুহূর্তে মন্দাকিনীর চোখের সামনে নেমে আসে নিকষ কালো অন্ধকার। একটি ফোন কলে পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যেতে থাকে তার।

রুক্মিণী বৃন্দাবনের নাটমন্দিরে কমলা, সুলোচনা, আরতী, লক্ষী, আরাধনা আর মালতীদের সাথে কৃষ্ণকক্ষে থাকে। রাতের সব কাজকর্ম সারে সকল মিলে। পুজোর ফুল, ভোগ, প্রসাদ সব পরিষ্কার করা, তারপর মূল্যবান জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা- সকলে মিলে করে। সব ঠিক করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়। মন্দাকিনী যাওয়ার পর থেকে প্রণামীর বাক্সের চাবি থাকে রুক্মিণীর কাছে। সব কাজ শেষে প্রণামীর পয়সা গুনে বাবার ঘরে নিয়ে যায় রুক্মিণী। আগে টাকা পয়সা গুনে বাবাকে দিত মন্দাকিনী, উনি সেগুলো সে রাতেই গুছিয়ে রাখতেন লোহার আলমারিতে।

এখন রুক্মিণী বাবাকে হিসাব বোঝাতে গেলে বলেন, 'রুক্মিনী, আমার কিছু ভালো লাগে না। তুই আলমারিতে তুলে রেখে যা।' রুক্মিণী টাকা পয়সা তুলে রাখে আলমারিতে।

আজ রাতে রুক্মিণী সারাদিনের পরা পুরোনো কাপড় ছেড়ে পরেছে নতুন ধোয়া একটা সাদা থান । কপালে পরেছে চন্দনের ফোঁটা। গায়ে মেখেছে গোপনে

বৃন্দাবনের বাজার থেকে কিনে আনা সুগন্ধি তেল। চুলে গুজেছে সাদা জবা।

রুক্মিণী আলমারিতে প্রণামীর টাকা গুছিয়ে প্রতিদিনের মতো বাবার মশারী টাঙিয়ে দেয়। আজ মশারীটা বিছানার চারিদিকে গুঁজে দেয় না। আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। বাবা গায়ে চাদর টেনে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ কেটে যায়, অন্ধকারে দুজন। রুক্মিণী বাবার খাটের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। রুক্মিণী বলে, 'বাবা, ঘুমিয়েছেন?'

'তুই এখনো এ ঘরে? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছিস? ঘরে যা।'

'বাবা, মন্দাকিনী চলে যাওয়ার পর আপনার অনেক কষ্ট।'

-'সে তো আর আসবে না, রুক্মিণী।'

'বাবা, আমি তো আছি আপনার পাশে। আপনার সেবায়। প্রতি রাতেই দাঁড়িয়ে থাকি। যখন বুঝতে পারি আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন আমি সখিদের সাথে ঘুমোতে যাই।'

'সে কি রে?আর মায়া বাড়াসনে তুই। এত কষ্ট করিসনে। যা ঘরে যা।'

'বাবা, আমি কি পারি না মন্দাকিনীর মতো আপনার সেবা করতে?' -বলে খাটের আরও গা ঘেঁষে দাঁড়ায় রুক্মিণী। বাবার শরীরের স্পর্শ লাগে ওর গায়ে।

বাবা চাদরের ভেতর থেকে একটা হাত বের করে রুক্মিণীর হাত ধরে বলেন, 'না রে। আর মায়া বাড়াসনে তুই। এ বয়সে মনটাকে আর দুর্বল করতে চাইনে। তুই যা তোর ঘরে।'

'বাবা, আমি মন্দাকিনীর ছেড়ে যাওয়া ঘরে কি থাকতে পারি না? আপনার পাশের ঘরেই থাকতে চাই আমি মন্দাকিনীর ফাঁকা ঘরে। আমি মন্দাকিনীর মতো আপনার পরিচর্যা করব। আপনি আমার কাছে যাবেন মন্দাকিনীর কাছে যেমন যেতেন। ভাববেন আমি আপনার মন্দাকিনী। বাবা, একবার চেয়ে দেখুন চোখ মেলে আমার দিকে।' এ কথা বলে ঘরের আলো জ্বেলে নিজেকে মেলে ধরে বাবার সামনে। কপালে চন্দনের তিলক, গায়ে সুগন্ধির আমন্ত্রণ। পরনের সাদা থান মেঝেতে গড়ায়। একটানে মশারী খুলে ফেলে রুক্মিণী। বাবার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে।

'স্বামী সংসার সব ছেড়ে আপনার চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি মন্দাকিনীকে মনে মনে হিংসা করতাম। তবু ভাবতাম আপনি তো ভালো আছেন। এবার দয়া করুন। আমাকে গ্রহণ করুন, বাবা। আপনাকে আমার সেবায় পরিতৃপ্ত করি এ আমার স্বপ্ন। আমার সাধনা মিথ্যে হয়ে যাবে? আমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, বাবা?' বাবার শরীরময় হাত বোলাতে থাকে রুক্মিণী।

শত উপাচার-গায়ের সুগন্ধি নিয়ে সারারাত সাধনায় লিপ্ত হয় সাধিকা নারী। ভোরের আলো ফোটার আগেই বৃন্দাবনের পাখিরা কিচির মিচির শব্দে জাগিয়ে তোলে নগরী। বাবার শরীর নিস্প্রভ হয়েই পড়ে থাকল। জাগ্রত হলো না বাবার শরীরের কোনো উপশিরা, কোনো স্নায়ুতন্ত্রি। নিষ্ফল রজনী। নিষ্ফল সাধনা। রাতজাগা

ক্লান্ত চোখে নিয়ে কমলাদের কৃষ্ণকক্ষে রুক্মিণী গেল পরাজিতের গ্লানি নিয়ে।

মন্দাকিনী দেবার্ঘ্যর বুকে মাথা রেখে ভাবতে থাকে বৃন্দাবনের নাটমন্দিরে তার ফেলে আসা ঘরে কি জমেছে অনেক ধুলো? তার ফেলে আসা ঘরে কি বিছানার চাদর পাল্টে নাটমন্দিরের রুক্মিণী, কমলা, সুলোচনা, আরতী, লক্ষী, আরাধনা আর মালতীদের কেউ কি দখল নিয়েছে বাবার?

জয়িতা বারাণসীর ঘরে আয়নার সামনে সাজতে বসেছে। কপালে লাল টিপ, সিঁথিতে দিয়েছে সিঁদুর। ধরতে হবে ফ্লাইট। সুটকেস সাজাতে গিয়ে ভাবতে থাকে কলকাতায় তার ওয়ারড্রবের রঙিন শাড়িতে না জানি জমেছে কত অভিমান। একটা উবের ডেকে নেয় আর রওনা হয় এয়ারপোর্টের দিকে। একটা ছোট্ট এস এম এস করে দেবার্ঘ্যকে, দুপুর দুটোয় পৌঁছব।

মন্দাকিনী খেয়াল রাখে দেবার্ঘ্যর মোবাইলে। এস এম এস আসে কাকতালীয় ভাবে তখনই। এস এম এস পড়ে মুছে ফেলে সে। আর মনস্থির করে ফেলে এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। ঠাঁই হবে না তার। সে চলে যাবে বৃন্দাবন। যা হয় হবে, যা আছে কপালে। পোড়া অভাগীদের কি আর হবে। দেবার্ঘ্য বেরিয়ে যায় অফিসে। কিছুই জানতে পারল না সে। বেরোনোর সময় মন্দাকিনীর কপালে হাত রেখে ও বলেছিল, 'কি গো, তোমার কি শরীর খারাপ?'

'আমি আসছি তাড়াতাড়ি।' বলে বেরিয়ে পড়ে দেবার্ঘ্য। দেবার্ঘ্যর যাওয়ার পথে চেয়ে থাকে মন্দাকিনী।

আর তো দেখা হবে না, এই তো শেষ দেখা। মাত্র কয়েকদিনের স্বামী-স্ত্রীর পুতুলখেলা।

ঘরে ঢুকে ভাবতে বসে ঘরের চাবি তো তার কাছে। বাড়ি অরক্ষিত রেখে কি করে বের হবে এভাবে, বুঝতে পারে না। দেবার্ঘ্যর বিছানায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে ঘড়িতে দেখে প্রায় দুটো বেজে গেছে। উঠে খুব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেয় সে। বেরোতেই হবে তাকে। এ ঘরে সে অবাঞ্ছিত এখন। দেবার্ঘ্য যে লাল শাড়ীটা কিনে দিয়েছিল সেটা ভরে নেয় স্যুটকেসটায়। স্যুটকেসটা নিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে বসে থাকে চাবির গোছা নিয়ে।

ওই তো দেখা যায়। একটা হলুদ ট্যাক্সি এগিয়ে আসছে এদিকে। থেমে গেল বাড়ির সামনে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে পেছন থেকে বড়ো একটা ব্যাগ নামিয়ে এক সুন্দরী মহিলা চলে এলো সোজা মন্দাকিনীর সামনে। বুঝতেই পারল এই দেবার্ঘ্যর স্ত্রী। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তার হাতে চাবিটা গুঁজে দিয়ে বলল, 'আপনার সম্পত্তি যত্নে রেখেছিলাম। এবার আমার ছুটি।' বলেই জয়িতাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জয়িতার পায়ে প্রণাম করে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। চাবির গোছা হাতে নিয়ে জয়িতা বসে পড়ল সিঁড়িতে। বসেই রইল পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে।

লক্ষণরেখায় নিখিল

একটা লক্ষণরেখা টেনে দিয়ে গেল সুমিত্রা। আর বলে গেল, 'ভেতরে সোনার কৌটোয় রেখেছি একটা আপেল। ছোঁবে না, খাবে না আমি না আসা পর্যন্ত।'

'তাহলে আমার কাজ সোনার কৌটো পাহারা দেওয়া?'

'আমি যতক্ষণ না ফিরব এটাই তোমার কাজ। আমি চললাম কবিবাসরে।'

'আমি যেতে পারিনা তোর সাথে?'

'সে কি করে হবে? ওখানে সব খাপছাড়া তরবারি। তুমিতো সেকেলে লেখক। সেখানে তুমি বড্ড বেমানান।'

শ্রাবণ সন্ধ্যায় টিনের চালে কেউ বৃষ্টির শব্দে মাতাল হয়েছেন? হননিতো, আমারও সেই অবস্থা। এখন আমি ওর বিশ্বস্ত খানদান। আমার নামেই ওর মহলে যত আপ্যায়ন, যত খোশামোদ। যাবার বেলায় পথে ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল সীতার বস্ত্রখন্ডের মত ওর কবিতার ছেঁড়া পাতা। যে কেউ যেন ওকে অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু আহাম্মকের দল জানে না যে সুমিত্রা কলিযুগের মেয়ে। ত্রেতাযুগ হলে রাবণের পঞ্চবটি বনে পাটি পেতে নিদ্রা যেত সহজ বিশ্বাসে।

সুমিত্রা আমাকে বলেছে, 'তোমার সব ছোটো গল্প আমি পড়েছি। শেষের গল্পটা দারুণ লিখেছ। খুব ভালো লেগেছে।'

'সুমিত্রা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। শেষের গল্পটাই আমার সেরা সৃষ্টি। সব পাঠকের মন্তব্যও তাই।'

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'তার শেষের কবিতা সেরা উপন্যাস।' সব কবির আচরণ একই রকম, তার শেষ কবিতার শেষ লাইনটা?—'জবর ছেড়েছি একখানা। ছেলেমেয়েরা আউড়ে বেড়াবে আড্ডায় অথবা পাণ্ডবদের পাঠশালায়।' আমিও তেমন বলেছি, 'সুমিত্রা, তোকে পেয়েছি আষাঢ়ের মিষ্টি গন্ধে। ছাড়ছি না তোকে।'

'আমিও ছাড়ব না তোমাকে। আমি যে তোমার ছোটোগল্পের নায়িকা গো। ওই যে রবিঠাকুর বলে গেছে—শেষ হয়ে হইল না শেষ। আমিও ঠিক তাই। আগের জন্মে ছিলাম তোমার পরমাত্মীয়। এ জন্মে তোমার সব গল্পেই আমিই তোমার উর্বসী। খেয়াল রেখ—সব গল্পেই যেন আমি থাকি। না হলে তোমার যে কটা চুল আছে, তাও থাকবে না।'

'থাকবে। থাকবে, আমার যে আপেলটা চাইই। যেমন ঈভ চেয়েছিল আদমের কাছে আস্ত আপেল। এ যুগে উল্টো—আমি চাই তোর আধখাওয়া আপেল।'

'দেখ কলি যুগের অন্তিমে চাওয়া পাওয়া কোথায় ঠেকেছে, আধখাওয়া আপেল পৃথিবী সেরা পছন্দ।'—সে কি হাসি সুমিত্রার, আপনারা কেউ যদি দেখতেন।

এমন সময় কোথা থেকে নিখিল উজবুকের মতো আমাদের মধ্যে এসে অন্তরঙ্গে রসভঙ্গ করল।

সাইকেলটা গাছে কোনো ভাবে হেলান দিয়েই শুরু করল, 'সে জন্যই আজকাল কেউ আর আনকোরা খোঁজে না। অভিজ্ঞতা চাই—বন্ধুত্বে বা বিয়েতে, বাথটবে বা বিছানায়, চাকরিতে বা পাহারায়।' নিখিলের ওই এক দোষ, শুরু করলে থামে না। একবার এক আসরে বলেছিলাম, 'নিখিল, কত দিলে এবার থামবি?'

'আপনিও দেখছি তাই। সুমিত্রাও একই রকম। ঠিক খুঁজে বের করেছেন ওকে। জমবে ভালো আপনাদের। ট্রোল হোক আর ইউটিউবে ভাইরাল, ঘাবড়াবেন না, পাবলিসিটি বাড়বে। আমার মনের কোণে যা একটু ইচ্ছে ছিল, ভাসিয়ে দিলাম পদ্মপাতায়।' বলে উল্টোদিকে সাইকেল নিয়ে যাত্রা শুরু করল নিখিল।

'সুমিত্রা, এই হচ্ছে নব্য প্রেমিকদের সমস্যা। অন্য কারও সাথে কথা চলবে না। শুধু ওর গলায় ঝুলে থাকতে হবে।'

আমি গলা চড়িয়ে ডাকলাম, 'নিখিল, যাস না । শোন। সুমিত্রার কোনো অপরাধ নেই। আমিই ওকে ডেকেছিলাম। শোন একবার।'

নিখিল ফিরে আসছে। যাবে কোথায়! জীবনানন্দ দাসের প্রেমের ফেরিওয়ালা এরা।

নিখিল চেপে ধরল, 'বলুন, কি বলছেন? সুমিত্রা আমারই আছে, থাকবে—এটাই বোঝাবেন তো? আর মাঝে মধ্যে একটু আধটু এখানে ওখানে এদিক ওদিক এর সঙ্গে ওর সঙ্গে—সুমিত্রার খেয়ালে সুমিত্রা চলবে, এই তো? তাহলে আর আপনার কি সমস্যা? করুন গল্প, মারুন আড্ডা। আজ সুমিত্রা, কাল মাধুরী। প্রশ্ন করলেই তো সুমিত্রা বলবে—মেয়েদের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে নেই? প্রেম করেছে বলে মেয়েরা কি মাথা বিক্রি করে দিয়েছে? কান ঝালাপালা হয়ে গেল এ বাণী শুনতে শুনতে।'

পাশ থেকে সুমিত্রা বলে উঠল, 'নিখিল, আমি না বলে পারছি না। তুই যে অপুদির সাথে গোয়া, লোনাভালা, বম্বে ঘুরে আসলি। তখন? তোকে আমি চিনি। ওই সাতদিনে অপুদির চা চেটে চেটে খেয়েছিস আমি বুঝি। পুরুষের বেলায় সাত খুন মাফ।'

'তুই যে এখন আপেল খাচ্ছিস দাদার সাথে? ভাগাভাগির আপেল? তখন?'

'দূর পাগলা। এতো পাহার দেওয়ার। আমি তো তোরই। একটু আধটু অযোধ্যা পঞ্চবটির ছোটোখাটো নখড়া—এগুলো ধরতে নেই। রামায়ণেও ছিল, মহাভারতেও ছিল, সম্রাট নেপোলিয়নেরও ছিল, দ্রৌপদীরও ছিল।'

তর্ক থামিয়ে সুমিত্রা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের দুজনকেই বলছি, সামনের সোমবার আমার আশীর্বাদ। না না কোনো অজুহাত দেখাতে হবে না। নেমন্তন্ন করছি না। করোনা চলছে, জাস্ট ইনফরমেশন। পরে খোঁটা দেবে। তাই বলে রাখলাম।'

নিখিল গম্ভীর হয়ে গেল এক মুহূর্তে। ওকে বললাম, 'চল তোকে পৌঁছে দেব তোর বাড়ি।'

'না আমি একাই যাব। আমি দুর্বল নাকি? সুমিত্রা তুই আমাকে আগে সব খুলে বলতে পারতি। ঠিক আছে। বেস্ট অফ লাক। তবে লোকটা কে রে? তোর কোম্পানির সেই বস, ওই বাসটার্ডটা যার সাথে তোরা কাশ্মীর ঘুরে আসলি?'

বলেই নিখিল সাইকেল চেপে ছুটল সোজা দক্ষিণে। আমি সুমিত্রাকে নিয়ে উত্তরে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্র সদনের দিকে।

রবীন্দ্র সদনের সামনে এসে সিমেন্টের বানানো বেঞ্চিতে বসে ওকে বললাম, 'সুমিত্রা ব্যাপারটা কি খুলে বলতো। তোর কি সত্যিই আশীর্বাদ?'

'আমার আশীর্বাদ তো তোমার কি? তোমারও কি নিখিলের মতো দুর্দশা হল?'

'না না তা কেন? আমার তো ঘরসংসার আছে?'

'না হেসে পারলাম না। তোমরা পুরুষমানুষগুলো বেসিকালি ছাগল—ভীতু। একটু এদিক ওদিক দেখলেই সংসার দেখাও। যেন মেয়েটা তোমার গলা টিপে ধরেছে।'

'যাক, কাজের কথা বল। সত্যিই কি আগামী সোমবার আশীর্বাদ? তাহলে নিখিলের কি হবে? এতদিন ঘুরলি ওর সাথে।'

-'শোনো শোনো, অপুদি ওকে ছাড়বে না। আর নিখিলও অপুদিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। নিখিলের রসায়নটা আমি জানি। হয়তো তুমি বলবে ওটা পারভারসান। হেক্সলি অবশ্য বলেছেন, সব পুরুষের মধ্যে একটা পারভারসান থাকেই। ওটাকে পারভারসান বলে ধরতে নেই। আমি অপুদির মতো অতটা সর্বংসহা পারদর্শিনী হতে পারব না।'

'তার মানে তুই নিখিলকে ভালোবাসিস না?'

সেদিন ঝরঝর করে চোখের জলে ভাসল রবীন্দ্র সদনের চত্তর। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল সুমিত্রা, 'আমি ভালো না বাসলে নিখিলকে আর কে এতোটা ভালোবাসবে বল? ও যে আমার সারা জীবনের শুকতারা।'

'তাহলে ওকে বিয়ে করছিস না কেন?'

'ওই যে বললাম, অপুদি। অপুদি আমাকে বলেছে—সুমিত্রা, তুই নিখিলকে ছেড়ে দে। সারা রাত অনেক কেঁদেছি। মন শক্ত করেছি। অপুদিকে এসএমএস করলাম, 'অপুদি, নিখিলকে দিয়ে দিলাম তোমাকে।'

'নিখিলও তোকে ভালোবাসে।'

'জানি। কিন্তু আমাদের বিয়েটা টিকবে না। বিয়ে করলে ও অপুদির কাছে চলে যাবেই। সব পুরুষ পলিগ্যামি—অন্তত কল্পনায়।'

কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'চল উঠি। বাড়ি যাই। ওদিকে চিন্তা করছে।'

সুমিত্রা আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আর কিছুক্ষণ বসো। খুব কষ্ট হচ্ছে নিখিলের জন্যে।'

ভারি হয়ে গেল বাতাসটা। ভাবলাম একবার বলি, 'সব ছেড়েছুড়ে যদি নিখিল চলে আসে তোর কাছে? মেনে নিবি ওকে?'

একটি রিকশা ও স্বাভিমান

'স্যার, আর কতদিন এভাবে ঘরে বসে থাকব? আমার শরীরে তো কোনো কষ্ট নেই।'

'নিতাই, মোট চৌদ্দদিন তোকে ঘরে থাকতেই হবে। কষ্ট না থাকলেও ঘরে থাকতে হবে।'

নিতাইয়ের করোনা ধরা পড়েছে। হোম আইসলেশনে থাকবে চৌদ্দ দিন। এ'কটা দিন নিতাই গাড়ি বের করতে পারবে না। তাই রিকশাতেই যাতায়াত করছি।

রিকশায় উঠে আমার একটা অভ্যেস রিকশাওয়ালার সাথে কথা বলতে বলতে যাই। ওদের কাছ থেকে নানান কথা জানা যায়। অনেক সময় এমন অনেক মূল্যবান কথা বলে যা অনেক জ্ঞানীব্যক্তির মুখেও শোনা যায় না।

চাঁপাডালি মোড় থেকে উঠে ওর সাথে কথা বলে জেনেছি যে ওর সংসারে আছে ওর চৌদ্দ বছরের মেয়ে আমিনা আর অসুস্থ বৌ। চলতে চলতে জেনে নিলাম ওর নাম কুরবান। কুরবান বলেছিল যে মোট তিনটি পেটের খাবার, বৌয়ের ওষুধ সব মিলিয়ে দুশো টাকা ওকে সারাদিনে আয় করতেই হবে।

'এই টাকা উঠে গেলে আর রিকশা টানি না বাবু, বাড়ি ফিরে যাই। ভাবছি আমিনার বিয়ে দিয়ে দেব, তাহলে একজনের খাওয়া খরচা জোগাড় করতে হবে না। আমাদের দুজনের একভাবে চলে যাবে।'

বিধান মার্কেটের সামনে পৌঁছোলে কুরবান বলল, 'বড়ো ছেলেটা বিয়ের ছয় মাসের মাথায় ওর মায়ের সাথে ঝগড়া করে বৌকে নিয়ে কাজীপাড়ার বস্তিতে চলে গেল। শুনেছি একটা নাতি হয়েছে। আমার দুঃখ কি জানেন বাবু? আজ পর্যন্ত নাতির মুখটা দেখতে পেলাম না।'

একটু থেমে বলল, 'দুইবেলা রিকশা টানতে বড়ো কষ্ট হয়, আজকাল হাঁপিয়ে যাই।' ওর কষ্টের কথা শুনে আমি আর রিকশায় বসে থাকতে পারছিলাম না। এক সময় মনে হল রিকশা থেকে নেমে যাই।

শতদল ক্লাবের মাঠের সামনে আসলে কুরবানকে বললাম, 'কুরবান, দাঁড়াও। আর যেতে হবে না । বাকি পথ আমি হেঁটেই যাব।'

'সে কি বাবু, আপনি সরোজ পার্কএ যাবেন বলে আমার রিকশায় উঠলেন, আর এই মাঝপথে নেমে যাবেন? আমার খুব লস হয়ে যাবে।'

'তুমি রিকশা থামাও। আমি হেঁটেই বাড়ি যাব। তুমি চিন্তা করো না, তোমাকে পুরো ভাড়াই দেব।'

আমি রিকশা থেকে নেমে পুরো কুড়ি টাকা ওর হাতে দিতে গেলাম। ও টাকাটা নিল না। বলল, 'আমি কি খুবই আস্তে চালাচ্ছিলাম, বাবু? আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই নেমে গেলেন? বয়স হয়েছে না! আমি কি আর আগের মতো জোরে টানতে পারি বাবু?'

'আরে না, সে জন্যে না। তোমার কষ্ট হচ্ছে দেখেই আমি নেমে গেলাম। এটুকু হেঁটেই যাব।'

'তা হলে আমি আপনার টাকা নেব না। আমি বুড়ো রিকশাওয়ালা দেখে অনেকে আমার রিকশায় উঠতে চায় না। এমন হলে তো না খেয়েই মরে যাব। আপনি ওঠেন, আস্তে আস্তে চালিয়ে ঠিক পৌঁছে দেব।'

ওর কথায় কি ভেবে আবার ওর রিকশায় উঠলাম।

কথা বলতে বলতে আমার বাড়ির সামনে এসে গেছি। রিকশা থেকে নেমে ওকে বললাম, 'তুমি ভেতরে এসো। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।' ও কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সাথে কি কথা বাবু? ভাড়াটা দেন, যাই। রিকশা না টানলে খাব কি?'

'ঠিক আছে, ভেতরে এসো। তোমার সারাদিনের যা আয় সেটা আমি তোমাকে দিয়ে দেব। তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

অবাক হয়েই আমার বসার ঘরে ঢুকল কুরবান। ঘরে ঢুকে আমার সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে ওকে বসতে বললাম। ও চেয়ারে বসতে চাইল না। পাশে একটা টুল ছিল, ওটা টেনে নিয়ে সামনে বসল।

এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম—

'তুমি তো বললে তোমার বাড়িতে তোমার বৌ আর মেয়ে আছে। তোমার বৌয়ের কি অসুখ?'

'কি অসুখ নেই তাই বলেন। সব আছে—প্রেসার সুগার বাত গ্যাস, সব। ওর ওষুধ কিনতেই তো আমার সব পয়সা চলে যায়।'

'তোমার মেয়ে পড়ে? স্কুলে যায় তো?'

'না বাবু, স্কুলে পড়াব তার টাকা কোথায়? একবার একটা কাজের জন্যে রাস্তার ওধারে তেল কলের মালিকের বাড়িতে পাঠালাম । তিন বেলা খাওয়া আর মাসে তিন হাজার টাকা বেতন।'

'এই চৌদ্দ বছরের বাচ্চা মেয়েকে না পড়িয়ে কাজে পাঠালে?'

'আগে শোনেন আমার দুঃখের কথা। প্রথম মাসে পুরো বেতনের তিন হাজার টাকা এনে আমার হাতে দিল। ভাবলাম যাক কিছু সুবিধে হবে। পরের মাসে একদিন সকালে দেখি আমিনা আর কাজে যায় না। আমি বললাম, কিরে আমিনা,

কাজে যাস না কেন? মেয়ে আমাকে বলল, আব্বু, আমি আর কাজে যাব না। আমার কাজ করতে ভালো লাগে না।

জানেন বাবু, আমার খুব রাগ হল। আমিনার গালে কষে একটা চড় মারলাম। মেয়ে আমার কাঁদতে লাগল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'ঘরে বসে বসে গিলবি। আমি বসিয়ে বসিয়ে তোকে খাওয়াতে পারব না।'

রাগের চোটে আমি ওর গালে আর একটা চড় বসিয়ে দিলাম—

'মুখে মুখে কথা? দূর হ আমার সামনে থেকে।'

ছোটো মেয়ে আমার আমিনা, বড়ো আদরের মেয়ে। কোনোদিন ওর গায়ে হাত তুলিনি। আজ আমি ওকে মারলাম! মনে অনেক কষ্ট নিয়ে রিকশাটা নিয়ে বেরোলাম। সারাদিন মন খারাপ। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে ওর মায়ের কাছে যা শুনলাম সেটা শুনে রাগে দুঃখে আমি মরে যাই, বাবু। ওর মায়ের কাছে শুনলাম—তেল কলের মালিকের বৌ একদিন বাড়ি ছিল না। মালিক আমিনার সাথে জোর করে খারাপ কাজ করল। মালিক বাইরে বেরোলে সন্ধ্যায় ওর বড়ো ছেলে জবরদস্তি আমিনার ইজ্জত নিল।'

'তা তুমি এর প্রতিবাদ করনি?'

'না বাবু, অনেক ভাবলাম। আমরা গরীব মানুষ। আমাদের কথা কেউ শুনবে না। সবাই ওদের পক্ষে কথা বলবে—দিনকাল যা পড়েছে । মাঝে মেয়েটার বদনাম হয়ে যাবে। মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না। চুপচাপ হজম করে নিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমিনার একটা বিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।'

টুল থেকে উঠে বলল, 'বাবু, এবার উঠি। অনেক কথা বলে ফেললাম। রিকশা না চালালে পেট চলবে না।'

আমি ওকে একটুখানি বসতে বলে ভেতরে গেলাম। আলমারি খুলে পাঁচ হাজার টাকা এনে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'আমি তোমার মেয়েকে পড়ানোর জন্যে আর তোমার বৌয়ের চিকিৎসার খরচ বাবদ এখন পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। মেয়েকে স্কুলে দাও। মেয়েকে পড়ানোর খরচা পরে যা লাগবে আমি সবটাই দেব।'

ও টাকাটা টেবিলে রেখে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'মাফ করবেন বাবু, জীবনে হারাম খাইনি কোনোদিন। আমি গায়ে খেটে খাই। আমি আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে পারব না।'

আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'এটা ভিক্ষে নয় কুরবান। এটা আমার কর্তব্য। আমি যদি এই কাজটি না করি তবে ভয়ানক অন্যায় হবে। তোমার চৌদ্দ বছরের নাবালিকা মেয়েকে লেখাপড়া না করিয়ে বিয়ে দেবে, এটা হতে দিতে পারি না।'

'না বাবু, লেখাপড়ার অনেক খরচা। ও আমি পারব না। তা ছাড়া মেয়েছেলের

লেখাপড়া শিখে কি হবে? বিয়েই তো দিতে হবে শেষে। একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেব। ও খেয়ে বাঁচবে। আমারও কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। আপনি টাকাটা রেখে দেন। আমি আপনার টাকা নেব না, বাবু।'

'দেখ কুরবান, তোমার চৌদ্দ বছরের নাবালিকা মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিও না। ওকে লেখাপড়া করাও। বড়ো হয়ে তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে। ওরও একটা ভালো ভবিষ্যৎ হবে। আমি তোমার মেয়ের সমস্ত লেখাপড়ার দায়িত্ব নেব, চিন্তা করো না।'

আমার অনুরোধে টাকাটা হাতে তুলে নিল। চোখে জল ধরে রাখতে পারল না কুরবান। আমি ওকে ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম।

শুনেছি ভোররাতে স্বপ্ন দেখলে সে স্বপ্ন খেটে যায়। কাল ভোররাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি—একটা মেয়ে সাদা অ্যাপ্রন পরে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে আমার চেম্বারে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'ও ডাক্তারবাবু, চিনতে পেরেছেন আমাকে? আমি আমিনা, ডাঃ আমিনা খাতুন।'

হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলাম। স্বপ্নটা যে শেষ হল না। মেয়েটা চলে গেল? ওকে কত কথা বলার ছিল। কত কথা শোনার ছিল ওর কাছে।

ত্রিকোণ চতুষ্কোণ

এই বয়সে এমন করে কেউ হারিয়ে যায়, বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারে জেদ দেখানো বা জেদ করার মতো বয়স পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই?

তার ঘরে একদিন ঢুকলাম আর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো পুরোনো পাঞ্জাবিটার পকেটে পেলাম একটুকরো ছেঁড়া কাগজ। মনে হল কোনো একটা চিঠির অবশেষ। যেটুকু পড়তে পারলাম,

"মাঝে মাঝে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি, 'আমি মানুষটা পৃথিবীতে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়।' নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিই আর মনটাকে একটু একটু করে শক্ত করতে চেষ্টা করি। কঠোর ভাবে নিজেকে শাসন করতে ইচ্ছে করে। মনে হয় মানুষ অন্যের প্রতি যতটা নির্দয় হতে পারে নিজের উপর ততটা নির্দয় হতে পারে না। আমিও ঠিক তেমনই সবকিছু এক সময় কেমন যেন ভুলে যাই। ভুলে যাই আমি এ পৃথিবীতে বেমানান।"

আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে চৈতন্য উদয়ের পর কি করে নিবারণ দাস ঘরছাড়া হল! তাহলে কি মানুষ দুটো মন নিয়ে বসবাস করে?

আমি সুনন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যারে, সুনন্দা, তুই কি লোকটার মতিগতি কিছুই বুঝতে পারিসনি?'

সুনন্দা নিবারণবাবুর বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'জানেন, আমি কখনও কখনও বুঝতাম, আবার কখনও কখনও ভুল বুঝতাম। আমারও হয়তো দুটো মন। কোনটা যে ঠিক ধরতে পারতাম না। এই যেমন আমি আপনাকে বুঝতে পারি না।'

আমি সুনন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কি আন্দাজ করতে পারছিস নিবারণবাবু কোথায় যেতে পারে?'

সুনন্দা বলল, 'তবে আমি বুঝতে পারছি লোকটা আর ফিরবে না, দুইদিন হয়ে গেল। তার তো টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই। ওর নিজের বলতে কেউ ছিল না। আমি যত দূর তাকে জানি—উনি খুব অভিমানী।'

আমাদের দুজনের কথার মাঝে সুজিত এসে উপস্থিত হল, "একটা মিসিং ডায়েরি করে এলাম। থানাতেও একশো গন্ডা প্রশ্ন, 'কেমন লোক, কোথাকার লোক? আপনাদের বাড়িতে কতদিন আছে, কেন আছে? আপনাদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?' আমি কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। প্রচণ্ড অপ্রস্তুত হতে হল আমাকে। তোমাকে তখনই বলেছিলাম, 'তোমাকে দেখতে এসেছে, ঠিক আছে

বয়স্ক মানুষ, একবেলা খাইয়ে ছেড়ে দাও।' শুনলে না। রেখে দিলে আমাদের সংসারে। তোমার এসব কাণ্ডকারখানা আমার পছন্দ না কোনোদিন।"

আমি বললাম, 'কিরে সুনন্দা, উত্তর দে। কিছু একটা বল।'

'সব কিছুতেই আমাকে একটা কিছু বলতে হবে কেন? আমার নিজস্ব ভাবনা বলে আমার কিছু থাকবে না? আমার একটা জগত আছে, থাকবে। আমারও ভালো লাগা আছে, থাকবে। কারও প্রতি আমার দায়িত্ব পালনের ইচ্ছে আছে, সে দায়িত্ব আমি পালন করব না?'

আমি বিতর্ক বাড়ালাম না। বুঝতে চাইলাম যে এই পৃথিবীতে আরও অনেক পৃথিবী লুকিয়ে আছে। সুনন্দারও একটা পৃথিবী আছে যেখানে নিবারণ দাসও হয়তো অন্য কোন জাহাজের নাবিক।

সুনন্দা নিবারণ দাসের বিছানা তোষক উল্টে কি যেন খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে কিছু হাতে লেখা কাগজ পেল সুনন্দা। সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ছলছল চোখে বলল, 'জানেন, ওর কেউ নেই? বাকি জীবনটা আমার কাছেই রাখতে চেয়েছিলাম। কাল রাতে আমার আর সুজিতের কথা কাটাকাটি শুনেছে হয়তো।'

সুজিত আর আমি দু'জনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। পৃথিবীতে কত কথা যে না বলা থেকে গেল শুধু পৃথিবীই জানে। সুজিত কিছু বলতে চাইল, বলল না।

সুনন্দা ওর ঘরে গিয়ে হাতে লেখা কাগজগুলোতে গভীরভাবে কি যেন খুঁজতে লাগল।

গত সোমবার সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে সুনন্দাদের বাড়ি গেলাম, যেমন যাই প্রায়ই। দেখি বারান্দায় দুটো চেয়ারে বসে সুজিত আর সুনন্দা। মাঝখানের টেবিলে চা আর চিকেন পাকোড়া। ঢুকেই বুঝলাম এ বাড়িতে সন্ধ্যার পরিবেশটা বেশ গম্ভীর। মনে হল সুনন্দা আর সুজিত কি যেন গভীর কোনো আলোচনায় মগ্ন।

আমি বলেই বসলাম, 'অসময়ে এসে আমি কি তোদের মধ্যে কথায় ব্যাঘাত ঘটালাম? তাহলে বরং এখন যাই। পরে কোনো এক সময় আসব।'

সুনন্দা আমাকে পাশের চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল—'না না বসুন। আপনি আমাদের ঘরের মানুষ। গরম চিকেন পাকোড়া বানিয়েছি। বসুন, পাকোড়া আর চা খেয়ে যাবেন।'

আমার জন্যেও ভেতর থেকে এক প্লেট পাকোড়া আর চা এনে এগিয়ে দিয়ে আচমকা বলে উঠল, 'আপনার সময় হবে? আমাকে কিছুদিনের জন্য দেওঘর নিয়ে যাবেন? উনি দেওঘরে শান্তি-সুধা নামে একটা বৃদ্ধাশ্রমে আছেন। ক'দিন আগে আমাকে ফোন করেছেন।'

'উনি কি ফিরে আসবেন? ওঁকে কি তুই আনতে যাবি?'

'উনি ফিরবেন না কোনোদিন। আর ফিরতে চাইলেও আমি এখানে থাকতে বলব না।'

'তাহলে?'

'আমি স্কুল থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছি। দেওঘরেই থেকে যাব আমি। ওখানে একটা ঘর ভাড়া নেব। যা হয় একটা চাকরি জোগাড় করে নেব।'

'এসব কি বলছিস, সুনন্দা? তোরা দুজন উচ্চ শিক্ষিত। হুটপাট কোনো সিদ্ধান্ত নিস না। নিজেরা বসে আলোচনা কর। আমি পরে একসময় এসে কথা বলব। এখন একটু ব্যস্ত আছি।' একথা বলে আমি দ্রুত ওদের মাঝ থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমি ওদের সমস্যার মধ্যে একজন হয়ে গেলে সমস্যা আরও জটিল হবে। তার চেয়ে ওরাই চেষ্টা করুক সমাধানের।

আজ সকালে সুনন্দা ফোন করল, 'একটু আসবেন বিকেলে? বাড়িতে একা আছি, আসুন। ও অফিসের কাজে বেরিয়েছে। বলে গেছে ফিরতে রাত হবে।'

'ঠিক আছে। বিকেল পাঁচটার দিকে আসব।'

পাঁচটার একটু আগেই গিয়ে হাজির সুনন্দার বাড়ি। রাস্তা থেকে দেখি ও দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সম্ভবত আমারই জন্যে।

ঢুকতেই আমাকে সোজা ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসাল। বুঝতেই পারছিলাম ও একটু মানসিক অস্থিরতায় আছে।

'আপনাকে সব বলব বলেই আপনাকে ডেকেছি আজ। আপনিই বুঝবেন। তা ছাড়া আমারও কিছু কথা আপনাকে বলা দরকার। আপনিও আমার জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গে মিশে আছেন।' বলতে বলতে সুনন্দা গ্লাসে ড্রিঙ্কস ঢালতে ঢালতে শুরু করল।

'নিবারন দাস আমার কে? কোনোদিন তো জিজ্ঞেস করেননি?'

'তুইও বলতে চাসনি। আর আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি তোকে জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা। তবে এটা বুঝতাম তোর খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ হবে, কারণ তোদের অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে দেখেছি।'

বরফের টুকরো ফেলে গ্লাসটা আমার হাতে এগিয়ে দিল সুনন্দা। দুজনেই গ্লাস ঠুকে ছোট্টো চিয়ার্স করলাম।

'শুনবেন? উনিই আমার জন্মদাতা। উনিই আমার বাবা।'

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। 'তাহলে সিদ্ধিনাথবাবু কে? আমি তো তাকেই তোর বাবা বলে জানি।'

'আমিও তাই এতদিন জানতাম। আমি আমার বাবাকে খুঁজে পেয়েছি।'

'অবিশ্বাস্য। তাহলে রিনা তোর মা না?'

'হ্যাঁ এইই আমার মা। সব শোনাব বলেই তো ডেকেছি আপনাকে। শুনুন সব।' এই কথা বলে সুনন্দা শুরু করল—

''তখন আমার বয়স পঁচিশ হবে। ইংরেজিতে মাস্টার্স করে এম এড শেষ করে

লরেটো কলেজে জয়েন করেছি। সুজিত বিরাট স্কলার, বড়ো চাকরি। আমার সাথে বিয়ে ঠিক হল। সামনের রবিবার বিয়ে। নেমন্তন্ন শেষ। প্রস্তুতি চুড়ান্ত। প্রচুর আয়োজন। বিয়ের আগের রাত—অনেক রাতেই পাশের ঘরে বাবা মায়ের কথোপকথন শুনে ফেললাম। বাবা মাকে বলছিলেন, 'সুনন্দার চাকরি হল। এবার ওর বিয়ে দিচ্ছি। কোনোদিন যদি তোমার বন্ধু এসে ওর পিতৃপরিচয়ে সুনন্দাকে দাবি করে? সুনন্দা জানতে পারলে আমাকে ত্যাগ করবে। আমার কি হবে তখন?'

মা বলেছিল, 'কি যা তা বলছ এই সময়ে? কাগজে কলমে তুমিই ওর বাবা। সুজাতা তোমাকে ভালোবাসে। কেউ তোমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।'

এ কথা শোনার পর আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। তা হলে এতদিন ধরে যাকে আমার বাবা জেনেছি তিনি আমার বাবা নন? তবে কে আমার বাবা?

মনে মনে সন্ধান শুরু করলাম। আমার বাবা কে আমাকে জানতেই হবে। কাউকে কিছু বললাম না। এর মধ্যে আমার বিয়ে সম্পন্ন হল। সুজিতের ঘরে চলে গেলাম। সুযোগ পেলেই বেহালা থেকে মায়ের কাছে চলে যেতাম। সিদ্ধিনাথবাবু কাগজে কলমে বাবা, তাই ঘরেই কাগজ খুঁজতে লাগলাম, নিশ্চয়ই কিছু একটা পাব। মা যখন থাকত না আমি পুরোনো কাগজপত্র ফাইল ইত্যাদি ঘাটতাম। কোথাও কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে যেতে লাগলাম। একদিন হঠাৎ বহু পুরোনো একটা মেডিকেল ফাইল নজরে পড়ে। তিরিশ বছর আগের অযত্নে পড়ে আছে আলমারির নিচের তাকে। সিদ্ধিনাথ চক্রবর্তীর বিভিন্ন রিপোর্ট। তার মধ্যে দেখতে পেলাম পরপর তিন মাসের তিনখানি সিমেন অ্যানালাইসিস অর্থাৎ বীর্য পরীক্ষার রিপোর্ট। সিদ্ধিনাথ চক্রবর্তীর সিমেন অ্যানালাইসিস, স্পারম কাউন্ট ছিল শূন্য। অর্থাৎ উনি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। রিপোর্ট হাতে নিয়ে সোজা মাকে চেপে ধরলাম, 'মা, তোমাকে বলতে হবে আমার বাবা কে।'

'এ তুই কোথায় পেলি, মা?' বলে মা কাঁদতে লাগল।

'মা তোমাকে বলতেই হবে—কে আমার বাবা। আমাকে জানতেই হবে।' বলে আমিও কাঁদতে লাগলাম।

মা আমাকে যা বলল তাই আজ আপনাকে বলব। মা আমাকে বলল, 'বিয়ের এক বছর পর থেকে তোর বাবার সাথে আমার চরম অশান্তি শুরু হয়। আমি একটা সন্তান চাই। আমি মা ডাক শুনতে চাই। তোর বাবা অনেক ডাক্তার দেখায়। কোনো কাজ হয় না। এক পর্যায়ে আমি তোর বাবার কাছে ডিভোর্স চাইলাম। বললাম, নিবারণকে বিয়ে করব। তোর বাবা আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে যেও না।' আমারও মায়া হল। কিন্তু আমার যে ভেতরে মাতৃত্বের আকাঙ্খা। তোর বাবা অফিসের কাজে বাইরে গেল সাতদিনের জন্য।

নিবারণ আমার ছোটোবেলার বন্ধু। দার্জিলিঙে এক পথদুর্ঘটনায় ওর স্ত্রী মারা

যায়। ও কোনোক্রমে বেঁচে যায়। তারপর আর বিয়ে করেনি। আমার সাথে যোগাযোগ ছিল, মাঝে মাঝে মোবাইলে কথা হত। ওকে আমি ফোন করে ডাকলাম। নিবারণ, তুমি আমার বন্ধু। আমি খুব মানসিক অস্থিরতায় আছি। সাতদিনের ছুটি নিয়ে আসবে আমার এখানে?'

ছোটোবেলার বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি নিবারণ। বাড়িতে এসেই জিজ্ঞাসা করেছিল, সিদ্ধিনাথ কোথায়? ওকে বলেছিলাম যে অফিসের কাজে সাতদিনের জন্য নৈনিতাল গেছে। ও একটু অবাকই হল। আমি বললাম, আমার ভালো লাগছে না, তাই তোমাকে আসতে বলেছি। সাতদিন আমার এখানে থাকবে। ও ঘোরতর আপত্তি করেছিল। চলেই যাবে। আমি কান্নাকাটি করলাম। ওকে বললাম কেউ জানবে না। সিদ্ধিনাথকে বলব না। তুমি প্লিজ থেকে যাও সাতটা দিন মাত্র।'

মা আমার কাছে অকপটে সব বলে যেতে লাগল—"ডিনারের পর রাতের বেলা নিবারণকে পাশের ঘরে বিছানা করে দিয়ে আসলাম। আমি আমার ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত একটা বাজে। তখনও জেগে আছি। আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা তোমার লজ্জা করল না একটুও?

মা কি বলেছিল জানেন?

'কি বলেছিল?'

মা বলল, 'লজ্জা করবে কেন? আমার মধ্যে কাজ করছিল মাতৃত্বের উদগ্র বাসনা। আর আমি তো নিবারণকে কিছু বলিনি যে আমার সঙ্গে সহবাস করতে হবে।

'তাহলে? আশ্চর্য!'

'নিবারণ রাতে আমার ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আমি দরজা খোলা রেখেছিলাম। আমি জানতাম ও রাতে আসবে। মেয়েদের শরীরে আহ্বানের একটা গন্ধ থাকে। সেটা পুরুষরা টের পায়। কিছুই বলতে হয় না। রাত হলে ঠিক কাছে চলে আসবে, ওরা যে কৃষ্ণ, ওরা যে মহাদেব। নিবারণও পায়ে পায়ে আমার ঘরে চলে এসেছিল। রাতে শুধু একবার বলেছিল, আমি তোমাকে একটা সুন্দর মেয়ে উপহার দেব।'

এরপর আমি যখন বুঝলাম তুই আমার পেটে এসেছিস আমি সব কথা তোর বাবাকে বললাম। এ কথা শুনে ও খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। —এ তুমি কি করে পারলে, রিনা? আমি বললাম, 'শান্ত হও। পৃথিবীর কেউ জানবে না ওর পিতৃ পরিচয়।'

তারপর তুই পৃথিবীতে আসলি। বড়ো হলি।"

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম। এবার আমি বললাম, 'তুই নিবারণবাবুকে কোথায় পেলি?'

'আমি মাকে কত করে বলেছি, আমার বাবার ঠিকানা দাও, মোবাইল নম্বর

দাও। আমি আমার বাবাকে দেখতে চাই। মা দিতে চায়নি। মা শুধু কাঁদত। আমিও কাঁদতাম। রক্তের টান উপেক্ষা করা যায়?' অবশেষে মা একদিন হার মানল আমার কাছে। ওর মোবাইল নম্বর দিয়ে বলল, দেখিস, এমন কিছু করিস না যেন সিদ্ধিনাথ দুঃখ পায়। আমি মোবাইল নম্বর নিয়ে চলে এলাম।'

ইতিমধ্যে শুরু হল করোনার প্যান্ডেমিক। চারিদিকে মৃত্যু। মা খবর পাঠাল ওদের দুজনেরই করোনা পজিটিভ। সুজিত যেতে নিষেধ করল। আমিও গেলাম না। ওরা দুজনেই মেডিকা হাসপাতালে ভর্তি হল। মা বাড়ি ফিরল। বাবা ফিরলেন না। প্রেসার সুগার অ্যাজমা সব ছিল। মাকে এখানে আসতে বললাম। মা বলল, না আমি জামাই বাড়িতে থাকব না। এখানে একাই থাকব। আমিও জোর করলাম না।

-'সুজিত জানে? ওকে কিছু বলেছিস?'

'না ওকে কিছু বলিনি। শুনুন এরপর—আমি একদিন ফোন করলাম বাবাকে। বাবা যেন আমার ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল। ওই যে বললাম—রক্তের টান। সব বললাম। বাবাকে আসতে বললাম আমার এই বাড়িতে। তারপরের ঘটনা সব আপনি জানেন।'

'সে না হয় বুঝলাম। তাই বলে সুজিতের সঙ্গে সম্পর্ক? সেটা তুই নষ্ট করতে পারিস না।'

'পারসোনালিটি কনফ্লিকট বুঝলেন? ওর সাথে আমার মনের মিল হল না কোনোদিন। শুধু বিয়েটাই যা হল। এটুকু বয়ে বেড়িয়ে কি আর হবে? আর শুনুন, কাল মা ফোন করেছে। মা দেওঘর পৌঁছে গেছে বাবার কাছে। বাকি জীবনটা বাবা মায়ের সেবা করি। বাবা মা শান্তি পাবে। আমিও শান্তি পাব। একটাই তো জীবন। জীবনের স্বার্থকতা কে কি ভাবে পায় সে শুধু নিজেই জানে। আমি সে ভাবেই ভেবে নিয়েছি।'

কোনো সিদ্ধান্ত না জানিয়ে আমি চলে এসেছিলাম। পরদিনই সুজিত ফোন করে বলল, 'সুনন্দা চলে গেছে।' আমি কোনো কিছু বলতে পারছিলাম না ওকে। সুজিত নিজেই এক সময় ওপার থেকে ফোন কেটে দিল।

প্রায় দুই মাস হতে চলল সুনন্দা বা সুজিতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে পারিনি। করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ে সকলেই ভীত, ব্যতিব্যস্ত। আমাদের একজন সিনিয়র ডাক্তার মারা গেলেন করোনায়। সব কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কিছু আর ভালো লাগছে না।

এর মধ্যে যেন শ্রাবণের ধারার মত একটা ফোন এলো আজ সকালে, 'আমি সুনন্দা। ভালো আছেন আপনি? তিনদিন হল সুজিত আমার এখানে এসেছে। এসেই ওর জ্বর। করোনার টেস্ট করিয়েছি। ওকে আর যেতে দেব না। সব শান্ত হলে আপনিও চলে আসুন এখানে। বড়ো ফ্লাট ভাড়া নিয়েছি। আপনার সাথেও একটা বোঝাপড়া আছে অনেক দিনের।'

অক্সিজেন সিলিন্ডার ও রামু

অক্সিজেন সিলিন্ডার কাঁধে ওপাড়ার ছেলে রামু। রামু দৌড়োচ্ছে। একদিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ—প্রাণের দিকে। একটি কালোবাজারি যুবকের থেকে অনেক বেশি দামে কিনেছে অক্সিজেন সিলিন্ডারটি।

'দাম যা হয় নাও'—পাশের বাড়ির মাসিমার প্রাণের দাম নীতিবোধের চেয়ে অনেক বেশি।

আমি বলেছিলাম, 'বেশি দামে কিনে তুমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে, রামু? জানো, এভাবেই ওদের এত বাড়বাড়ন্ত? নীতিহীনতায় ছেয়ে যাচ্ছে দেশ।'

আমার দিকে হা করে তাকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর হাত কচলে বলল, 'বাবু, আপনার জ্ঞান শুনলে মাসিমা মরে যেত। মাসিমা চোখ মেলেছে, হাত পা নেড়েছে, বিছানায় উঠে বসেছে, দুপুরে দুটো খেয়েছে। আমার পয়সা উসুল, খাটনি উসুল। আর কি চাই?'

কাছে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'বাবু, ওদের হাত অনেক লম্বা। ওদের কিচ্ছু করতে পারবেন না। ভরসন্ধ্যায় এই ফাঁকা পার্কে আর কতক্ষণ বসে থাকবেন? সবাই চলে গেছে। ঘরে যান। টিভি সিরিয়াল দেখুন। কাজে লাগবে।'

কোথা থেকে সুতপা এসে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বাবা, এই অন্ধকারে একা পার্কে বসে কি করছেন? ইন্দ্র আপনাকে খুঁজতে গেছিল রাধাকাকির বাড়ি। ইন্দ্র এসে বলল—রাধাকাকিকে এ্যাম্বুলেন্সে করে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে। অক্সিজেন স্যাচুরেসন খুব কমে গেছে। অক্সিজেন লাগবে কাকির। ওদিকটা করোনায় ছেয়ে গেছে। বাড়ি চলুন।'

সুতপা হাত ধরে টেনে তুলল। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে থেকে আমার নাকের উপর মাস্কটা টেনে ঠিক করে নিলাম।

চশমাটা ঠিক করতে গিয়ে দেখি চশমার কাঁচে অনেকগুলো জিজ্ঞাসা চিহ্ন সেঁটে রয়েছে। ঘসে ঘসে তুলতে পারলাম না।

রাতের আগন্তুক

(ভুতের গল্প)

ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল। ইন্দ্রাণী অফিস থেকে আজ একটু দেরি করে ফিরেছে। কিছুক্ষণ আগে রাতের খাবার ওভেনে গরম করে খেয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে পুরো ফ্লাটের সব লাইট হঠাৎ নিভে গেল। লোডশেডিং হলেও এতক্ষণে কেয়ারটেকারের জেনারেটর চালানোর কথা। সেটাও এখনও চালু করল না। এমন তো হয় না কোনোদিন। গরমে এসি, ফ্যান কিছু চলবে না, বুঝল বেশ কষ্ট হবে।

ঘরের মধ্যে এমার্জেন্সি লাইটটা জ্বালিয়ে ঘুমোনোর আয়োজন করছে এমন সময় আচমকা অতনু দরজা ঠেলে ইন্দ্রাণীর শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

ইন্দ্রাণী ভুত দেখার মত চমকে উঠল, 'তুমি এত রাতে? এই অন্ধকারে? এ ফ্লাটে কি করে ঢুকলে?'

অতনু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বলছি, বলছি শোনো।'

অবাক হয়ে ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বর্ধমান থেকে এখানে? গত দুদিনে কত বার রিং করলাম তোমাকে। বলছে, মোবাইল সুইচড অফ। কি ব্যাপার বলতো।'

'বলছি, আমার বন্ধু সুকৃতির করোনা হয়েছে। খুব খারাপ অবস্থা। অক্সিজেন স্যাচুরেশন আটাত্তর। ওকে এনে নিউ গ্লোবাল হাসপাতালে ভর্তি করাতেই এতো রাত হয়ে গেল। করোনা রোগী ভর্তি করানো যা ঝামেলা! ডাক্তারের কথা বার্তা আর হাবভাবে মনে হল বাঁচবে না সুকৃতি। ওকে ভর্তি করিয়ে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়েছি আর অমনি লোডশেডিং। সে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি—ঘন অন্ধকার। লোডশেডিংএ ওদেরও জেনারেটর বিকল। বাইরেটা জনমানব শূন্য। এতো বড়ো হাসপাতালেও এমন ভুতুড়ে পরিবেশ। ভাবা যায় বলো?

ভাবলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে তোমার এখানে চলে আসি, তোমাদের গেস্ট রুমে রাতটা কাটিয়ে যাব। এখানেও এসে দেখি লোডশেডিং। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানেও জেনারেটর খারাপ। কোথাও দারোয়ানকে দেখতে পেলাম না। একটা ঝুঁকি নিলাম। চুপিচুপি তোমার ঘরে পৌঁছে গেলাম।'

'কেউ দেখেনি তো তোমাকে? লিফট নেই। এই আটতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসলে? দারোয়ান দেখতে পায়নি তো?'

'না না, কেউ আমাকে দেখেনি। বাইরে লোডশেডিং। সেই সাথে যা বৃষ্টি আর অন্ধকার।'

'হ্যাঁ জেনারেটরও তো চলছে না।'

'আমি সেই সুযোগেই ঢুকে পড়লাম, বুঝলে? আর একটা কথা শুনেছ? কলকাতায় ফ্লাটগুলোতে নাকি খুব ভুতের উপদ্রব শুরু হয়েছে? সকলেই বলাবলি করছে। লোডশেডিং এর সময় ভুত এসে জেনারেটরগুলো নাকি নষ্ট করে দিচ্ছে?'

অতনুর কথাটা শুনে ইন্দ্রাণী কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল।

'তাই?'

'সেকি ইন্দ্রাণী, তুমি কি ভুত বিশ্বাস কর?'

নিজেকে সামলে নিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, 'দূর, ভুত বলে কিছু আছে নাকি? তুমি তো জান আমি ওসব বিশ্বাস করি না।' একথা বলেই ইন্দ্রাণী অতনুকে দাঁড়িয়ে না থেকে চেয়ারে বসতে বলল।

'অতনু, বলোতো, এত রাতে কি খেতে দেব তোমাকে? ঘরে কিছু নেই। দাঁড়াও ফ্রিজে কোল্ডড্রিংকস আছে। খাবে?'

'কিছু না খেলেও চলবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে দাও, কোল্ডড্রিংকসই দাও।'

কোল্ডড্রিংকস এর বোতলটা বের করে অতনুর সামনে টেবিলে রেখে ওয়াশরুমের বেসিনে হাত ধুতে গেল ইন্দ্রাণী। ফিরে এসে দেখে অতনু কোল্ডড্রিংকস এর পুরো বোতল শেষ করে ফেলেছে। অবাক হয়ে ইন্দ্রাণী বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে বুঝি? এক নিমেষে এক লিটারের বোতল শেষ করলে কি করে?'

'হ্যাঁ খুব খিদে পেয়েছিল। ইন্দ্রাণী, আমি কিন্তু আজ তোমার বিছানায় তোমার সাথেই শোবো।'

অতনুকে দূরে ঠেলে দিয়ে ও বলল, 'সে কি করে হয়? একেবারেই তা হবে না। তুমি আমার বিছানায় শোও। আমি মেঝেতে একটা চাদর পেতে রাতটা কাটিয়ে দেব।'

'ইন্দ্রাণী, কি যে বল তুমি! দুদিন পর আমাদের বিয়ে। আমি তোমার সঙ্গে আজ রাতে শুতেই পারি।'

এই বলে একপ্রকার জোর করেই ইন্দ্রাণীকে ধরে টেনে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। ইন্দ্রাণীও বিশেষ বাধা দিতে পারল না। অতনুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এমার্জেন্সি লাইটটা অফ করল। ঘরে নেমে আসল এক মায়াবী অন্ধকার। অতনু ইন্দ্রাণীকে কাছে টেনে নেয়। ঘরে নেমে আসে যতখানি অন্ধকার, অতনু হয়ে ওঠে ততখানি অব্যর্থ, হতচকিত পুলকিত ইন্দ্রাণী নিজের বিন্যাসে তখন কেবলই বিভোর।

সুখের আবেশে আনন্দ আতিশয্যে ইন্দ্রাণী একসময় গভীর ঘুমে হারিয়ে যায়। সকালে ঘুম ভাঙতেই অবাক, একি! ওকে না ডেকেই অতনু চলে গেল! ঘড়িতে

দেখে সকাল আটটা। ইন্দ্রাণী ভাবল, ঘুমের ব্যাঘাত হবে তাই হয়তো ওকে আর ডাকেনি। ওর মোবাইলে ফোন করল। মোবাইল সুইচড অফ।

মোবাইল অন করতে ভুলে যাওয়া ওর এই এক বাজে অভ্যেস। এ নিয়ে ওকে কত বকেছে ইন্দ্রাণী।

অফিসে ছুটতে হবে এখনই, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে হবে। আজ ওর মনে এক অন্য রকম আনন্দ। খুশিতে ওয়ারড্রব থেকে গাঢ় কলাপাতা রঙের শাড়িখানা বের করে পরে নেয়। গত জন্মদিনে অতনু ওকে এই শাড়িটা উপহার দিয়েছিল। ওরও শাড়িটা খুব পছন্দ। ওরই দেওয়া ওরই পছন্দের শাড়ি পরে অফিসে যাবে আজ।

অফিসে বেরোনোর আগে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দশ মিনিটের জন্য টিভিতে খবর দেখার অভ্যেস ওর।

টিভিতে খবরের চ্যানেল অন করতেই খবরে দেখাচ্ছে, 'বর্ধমানের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অতনু রায় গতকাল রাত দশটায় করোনা আক্রান্ত হয়ে নিউ গ্লোবাল হাসপাতালে মারা গেছেন। কাল বিকেলেই তাকে বর্ধমান থেকে কলকাতায় নিউ গ্লোবাল হাসপাতালে এনে ভর্তি করানো হয়। নিমতলা শ্মশানে রাতে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। অতনুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী নিমতলা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।'

রাতে কোল্ড ড্রিঙ্কসের যে বোতলটা অতনু খেয়ে শেষ করে টেবিলে রেখেছিল, এখন দেখছে সে বোতলটা ভর্তি পড়ে আছে টেবিলের উপরই। তা হলে!

ইন্দ্রাণী ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল। ভয়ে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল।

অনাবৃত যন্ত্রণা

তরুলতাকে রাস্তার ধারে জঙ্গলের ভেতর টেনে নিয়ে গেল হাতকাটা বিষ্টুর দল। তরুলতার আর্ত চিৎকারে বিদীর্ণ হয় জঙ্গল। বিষ্টুর দলের উল্লাস প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে তরুণীর ভয়ার্ত হৃদপিণ্ডে। যদি জঙ্গলের সকল বৃক্ষ কথা বলে উঠতে পারত তবে এমন কত তরুণীর সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনি শোনাতে পারত।

যদি জঙ্গলের সকল পাখি ডানা ঝাপটাতে পারত তবে কত লাঞ্ছনার যন্ত্রণা শোনাতে পারত সেসব পাখি।

যদি এ জঙ্গলের মাটি শুকিয়ে একবার ধুলো হয়ে আকাশে উড়তে পারত তবে কত সম্ভ্রমহানির রক্তমাখা চিত্র এঁকে আকাশটাকে রক্তাক্ত করে দিতে পারত সে মাটি।

বোবা ওরা—কিছুই পারেনা, জঙ্গল শুধুই বোবা সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে জানে। যাওয়ার আগে পুরাতন বৃক্ষ নতুন শাবকের কানে বলে গেছে ওর সমস্ত ব্যথা। যাওয়ার আগে বৃদ্ধ পাখিটি নতুন ফুল কুঁড়িকে শুনিয়ে গেছে তরুণীর শেষ প্রার্থনা।

রক্ত সিক্ত মাটি তরুণীর কথা নিজ বুকে নিয়েছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, 'আর পারছি না।'

-'হা হা হা হা, পারবি না মানে? পারতে হবে তোকে। দলের সবার হবে তারপর তোকে ছাড়ব। কোথায় তোর মাস্টারদাদা? ডাক তাকে। আমাদের জেলে ঢোকাতে বল।'

জেল থেকে জামিন পেয়ে ছাড়া পেয়েছে পরশু। ছাড়া পেয়েই অপারেশন বিষ্টুর দলের। দলবল নিয়ে রাতে পিস্তল ঠেকিয়ে তুলে এনেছে বাগদিপাড়ার তরুলতাকে, ওর দাদার সামনে থেকেই। হাত পা মুখ বেঁধে রেখে এসেছে ওর দাদাকে। ওর দাদা থানায় নালিশ করেছিল তোলাবাজ বলে।

'দাদা, ওদের পেছনে লাগতে যাস না। আমাদের ক্ষতি করে দেবে।' তরু ওর দাদাকে কত বকেছে, শোনেনি প্রতিবাদী দাদা।

'ঠিক করলে না, মাস্টার। ফিরে এসে সব হিসেব মেলাব।' পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন চিৎকার করে পুলিশের সামনেই বলছে বিষ্টু।

দুদিন হল জামিন পেয়ে পাড়ায় ফিরেছে বিষ্টু আর চাঙ্কি। ভয়ে সেঁটিয়ে আছে তরু। মাস্টার দাদা বলেছে, 'থাম তো। কিচ্ছু করবে না। জেলের ভয় আছে না?'

ভোম্বল ওদের পরিকল্পনা জানতে পারে একেবারে শেষ মুহূর্তে তখন ওদের সাবধান করার সুযোগটুকুও ছিল না। সামান্য প্রতিবাদ করেছিল তরুলতাকে তোলার সময়। সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্কি ওর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলেছে, 'জেলের ভাত আমরা খেয়েছি। শালা ট্যাঁ ফো করবি তো তোকে আগে শেষ করব। আমাদের দলে থেকে গাদ্দারি চলবে না।' কিছু বলতে পারেনি ভোম্বল। প্রাণের ভয়ে মুখ বুজে থেকেছে। আগে প্রাণ তারপর প্রেম ভালোবাসা। ওর চোখের সামনে তরুলতাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ওরই দলের সাগরেদরা। ও ভালোবাসে তরুলতাকে। তরুলতা অবশ্য সে ভালবাসার কথা কিছুই জানে না।

তরুলতা অনেক কষ্টে কাতর কণ্ঠে বিষ্টুকে বলল, 'আর পারছি না, বিষ্টুদা। মরে যাব আমি। আমাকে ছেড়ে দাও এখন। বাঁচতে দাও আমাকে। কাউকে কিছু বলব না। মরতে চাই না। আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

দলপতি হাতকাটা বিষ্টু বলল, 'ঘণ্টু, মেয়েটা বেঁচে আছে রে। তোর হয়েছে? ওঠ ওঠ। ছেড়ে দে এবার। না হলে মরেই যাবে মেয়েটা।'

'ছিনতাই ডাকাতি করছ করো, মেয়েছেলেদের নিয়ে টানাটানি করছ কেন? সব শালা করোনা হয়ে মরবে। কেউ বাঁচবে না, কেউ বাঁচবে না', ভোম্বল বিড়বিড় করে বলতেই দলপতি দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'কি বললি ভোম্বল? আর একবার বল। তোকে মেরে এ জঙ্গলে শেয়াল কুকুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। জ্ঞান দিচ্ছে ধর্মপুত্র। মেয়েটার জন্যে প্রেম উথলে উঠছে শালার। শরীরে মুরোদ নেই সেটা বল। তাকত লাগে তাকত, বুঝলি?'

চাঙ্কি বলল, 'ভোম্বল, তুই তো যুধিষ্ঠির, কিছুই করলি না। যা মেয়েটাকে রাস্তার ধারে ফেলে আয়। ও নিজেই পৌঁছে যাবে, না হয় অন্য কোনো যুধিষ্ঠির ঠিক ওকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেবে।' পচা তুই ভোম্বলের পেছন পেছন যা। উল্টোপাল্টা দেখলে দুজনকেই গুলি করে সটকে পড়বি। আমি এ পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করি না।'

ভোম্বল কাঁধে তুলে নেয় সংজ্ঞাহীন তরুলতাকে। রাস্তার দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে সে। ভোম্বল তরুলতাকে ভালোবাসে বুঝলেই এরা মেরে দেবে। এ লাইনে প্রেম ফ্রেম চলে না—বিষ্টু বলেছিল। কেউ পেছনে লাগলেই পাল্টা ঝেড়ে দাও, নিকেশ করে দাও, মেয়ে, বউ না হয় বোনকে তুলে আনো—মস্তি কর। সারা জীবনের মতো শিক্ষা হয়ে যাবে। মাথা থেকে বিপ্লব ছুটে যাবে।

টু শব্দ করতে পারে না—একটু বুঝতে পারলেই ভোম্বলকে গুলি করে মেরে দেবে হাতকাটা বিষ্টুর লোকেরা।

এমন একদিনে পাঁচটি বছর আগে তার দিদিকে খুঁজে পেয়েছিল এই জঙ্গলে।

প্রাণ ছিল না তার। কাঁধে করে নিয়ে মায়ের সামনে রেখেছিল নিথর দিদিকে। সাতদিন পর হাতকাটা বিষ্টু এসে পিস্তল দেখিয়ে মাঝরাতে তুলে নিয়ে গেছিল ভোম্বলকে।

'দেখ ভোম্বল, আমরা জানতাম না মেয়েটা তোর দিদি। ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছিল, চাঙ্কি তুলে আনল। সবাই এত মাল খেয়েছিল যে কখন ও মরে গেছে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি।' বিষ্টু বলল ভোম্বলকে।

'আমাকে ছেড়ে দাও গুরু। আমি আর এসব দলে থাকব না। আমি কাজ করে খাব।'

একথা শুনে বিষ্টুর সেকি হাসি, 'হা হা হা হা, কাজ করে খাবি? এ দলে ঢোকা যেমন কঠিন, বেরোনোও তার চেয়ে অনেক কঠিন রে বাপ। লাশ হয়ে বেরতে হয়। শালা, তোকে ছেড়ে দেব আর আমাদের দলের খবর পুলিশে পেয়ে যাক।'

'আমি কাউকে কিছু বলব না।'

চুলের মুঠি ধরে ভোম্বলের মাথাটা মুখের কাছে এনে ভোম্বলকে বিষ্টু বলল, 'একটা গুলি খরচা করব। তারপর তোর দিদির মত তোকেও পোঁছে দেব তোর মায়ের কাছে। এখনই যাবি মায়ের কাছে?'

বিষ্টুর হাতে পিস্তলের নাড়াচাড়া দেখে ভোম্বলের মুখটা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ভোম্বল এর আগে দেখেছে একটু এদিক ওদিক করলে বিষ্টু দলের লোককে পাখির মতো গুলি করে মারতে এক সেকেন্ডও সময় নেয়নি। ভোম্বল দেখেছে প্রাণ নিয়ে কেউ এ দল ছেড়ে বেরোতে পারেনি।

অন্ধগলির পরিত্যক্ত বাড়ির দোতলার ফাঁকা ঘরে বিষ্টুর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আমি বাঁচতে চাই। আমাকে মেরো না, গুরু। আমার বাঁচার খুব দরকার।'

তরুলতাকে পৌঁছে দিয়ে মাস্টারদাদার সাথে অনেক কথা আছে ভোম্বলের। অনেক হিসেব আছে।

লকডাউন

বেশ কিছুদিন লক্ষ করছি বাড়ির কাজের মেয়েটা আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। সুযোগ পেলেই আমার ঘরে ঢুকে পড়ে যে কোনো সুযোগে, যে কোনো অজুহাতে। আমি হয়তো লিখছি তখন এসে আমার অলক্ষ্যে আমার ঘরের এক কোণে দাঁড়ায়। আমি বলি, 'মালতি, কি চাস? কিছু বলবি?'

'কিছু না বাবু।' বলেই সরে যায় দূরে। যখনই সুযোগ পায় সে আমার কবিতার বই নাড়াচাড়া করে। আমি ঢুকে পড়লে বই রেখে বিছানা ঝাড়ে না হয় আমার ঘর গোছানো শুরু করে।

আমি অনেক সময় কবিতা পড়ি ঘরের মধ্যে গলা ছেড়ে। মালতি আমার ঘরের বাইরে দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি বুঝতে পারি। আমি ওর পায়ের খসখস শব্দ টের পাই। নন্দিনী ওকে বকুনি দিল, 'এই মালতি, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস। যা কাজে যা। সব কাজ পড়ে রয়েছে।'

নন্দিনী উঁকি দিয়ে দেখে গেল আমি একটা গেঞ্জি গায়ে আমার শেষ প্রকাশনা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে কবিতা পড়ছি।

ডাকলাম ওকে, 'নন্দিনী, কবিতা শুনবে? গতকাল বইখানা হাতে পেলাম। এই করোনার মধ্যে বইখানা বের করেই ছাড়লাম।'

'না, এখন আমার কবিতা শোনার সময় নেই। হাতে অনেক কাজ। রাতে শুনব।'

বিকেলে টেবিলে ঝুঁকে নাকে চশমা গুজে আমি ব্যস্ত আমার কবিতার খাতায়, আমার ঘরে ঢুকে প্রতিদিনের মতো আমার টেবিলে আমার চা আর বিস্কুট রাখে মালতি। আজ দাঁড়িয়ে থেকে মালতি হাত কচলে বলে ওঠে, 'বাবু, একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ, বল কি বলবি?'

'আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে দাও না গো বাবু।'

'কেন হঠাৎ তোকে নিয়ে কবিতা লেখার আবদার কেন রে?'

'কেন বাবু, তুমি তো কত রকম কবিতা লেখ। আমাকে নিয়ে একটা লিখতে পারবে না?'

'আচ্ছা আচ্ছা আগে বল, তোর কোনো দুঃখ আছে? কষ্ট আছে? কোনো ব্যথা আছে?'

‘না বাবু, আমার কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ব্যথাও নেই। আমি আপনাদের বাড়ি কাজ করে ঘরে ফিরি। ভানু সারাদিন রিক্সা চালিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। হাঁড়িতে চাল ফুটোই। দুজনে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি। ভানু আমাকে খুব সোহাগ করে, বাবু। আমার কোনো কষ্ট নেই।’

‘তাহলে কবিতা হবে কি করে? কষ্ট, দুঃখ, ব্যথা না হলে কবিতা হয় না রে।’

‘কেন, তোমরা সুখ নিয়ে কবিতা লেখ না?’

‘আচ্ছা বল তো, ভানু অনেক রাত করে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে? তোকে মারে? অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরে?’

‘না বাবু, ও খুব ভালো। ওসব ছাইপাস খায় না। ও এসবের মধ্যে নেই।’

‘তাহলে কবিতা হবে কি করে? তুই অন্য কারও সাথে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে যাস? অন্য কাউকে তোর ভালো লাগে?’

‘কেন বাবু? ভানুই তো আমাকে সিনেমায় নিয়ে যায়। এসব কি কথা বলছেন আপনি?’

‘তাহলে কবিতা হবে কি করে?’

‘কেন বাবু, আমাদের সুখ নিয়ে কবিতা হবে না?’

‘হবে। কিন্তু সে কবিতা মানুষ খাবে নারে, মালতি।’

‘মানুষ আবার কবিতা খায় নাকি? ও দিদি গো, শিগগিরই এদিকে এসো। এই লকডাউনে বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।’

বলে নন্দিনীর খোঁজে রান্নাঘরের দিকে ছুটল মালতি।

রামু ও অভ্যস্ত অধ্যায়

কেমন একটু আনমনা হয়েই হাঁটছিলাম টাকি রোড ধরে। একদিক দিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে গাড়ি। আর এদিকে যাচ্ছে ঠেলাঠেলি মানুষ। দু'টোই ভয়ের। এদিকে গাড়ি চাপা পড়ে মরতে পারি। আর ওদিকটায় মাস্ক পরেনি মানুষ, করোনা হয়ে মরতে পারি। হিরো হণ্ডা বাইকের গতি কমিয়ে ছেলেটা বলে গেল, 'একটু দেখে পথ চলুন। মরবেন তো।'

এ রাস্তায় আবার ফুটপাত নেই। আমারও কোনোদিন দিবাস্বপ্নের অভ্যেস নেই। আমার জন্যে ফুটপাথ বাহুল্য। আমি মানুষ এড়িয়ে রাস্তার দিকটাই বেছে নিলাম। গাড়ি চাপা পড়ে মরলে কেউ একটা ফুলের মালা দেবে, ধুপ জ্বালাবে, কেউ বা দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে হয়তো। মৃত্যুর পর সকলেই এটুকু আশা করে। তা হলে আমারই বা দোষ কিসের!

আর মানুষের দিক ঘেঁষে হাঁটলে করোনা ছোঁবে। মরলে কেউ কাছে ঘেঁষবে না, ফুলমালা তো দূর অস্ত। আর পাঁচটা বেওয়ারিশ হতভাগার সাথে এক চুল্লিতে ভাগাভাগি করে অন্তিমে যাত্রা।

ছেলেটা দেখলাম বাইক চালিয়ে এদিকটায় আসছে। ও তো আমার দিকেই আসছে। ভাবলাম আবার কিছু বলবে হয়তো। আজকালকার ছেলে ছোকড়ারা মানসম্মান রেখে কথা বলে না। রাস্তার গা ঘেঁষে বাইক থামিয়ে আমাকে বলতে শুরু করল, 'রাগ করেননি তো? আমি ও পাড়ার বখাটে ছেলে রামু। আপনার কিছু হলে আপনার ছেলের বউ সুজাতা বউদি আমাকেই ফোন করবে, রামুদা রামুদা, একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার জোগাড় করে দাও না। একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দাও না। আমার শ্বশুরের খুব শরীর খারাপ।'

কথার মধ্যে ছেলেটার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলটা কানে গুঁজে কথা বলতে বলতে সিনেমার হিরোদের মতো বাইক নিয়ে ছুটল উল্টো দিকে। হঠাৎ ডাইনে বাঁক নিয়ে নিমেষে সামনের গলিতে উধাও হয়ে গেল।

আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রণাম করলাম। এখনও ঠাহর করতে পারছি না, আমি কি ঈশ্বরকে প্রণাম করলাম না ওই ছেলেটিকে প্রণাম করলাম।

ভয়

(রম্যরচনা)

'বিক্রি হয়ে গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' এই কানাঘুষা আমিও শুনতে পেয়েছিলাম। আমাকেও থমকে দিল ইদানিং কালের সহজলভ্য ভাষা—'সত্যতা যাচাই করা হয়নি, দর্শক।' আমিও একটুখানি ভাবতে বসলাম।

ভাবতে গেলে সামনে কাউকে প্রয়োজন হয়। মাঝখানে কিছুদিন আমাদের হুলো বেড়ালটাকে সামনে পেতাম না।

বেড়ালটা আজকাল আবার ঘুরঘুর করছে আমার চারপাশে। বেড়ালটা ছিল, মাঝে বেড়ালটা ছিল না আবার বেড়ালটা চলে আসল মঞ্চে, বুঝতেই হবে নাটক কিছু একটা মঞ্চস্থ হয়ে গেল।

বেড়ালটা আর পাশের বাড়ি যাচ্ছে না। আগে খুব যেত। পরে জানতে পারলাম ইদানিং ওবাড়ির নিধুবাবু নিয়মিত ফেসবুকে কবিতা পোস্ট করছেন, তাই আমাদের বাড়ির বেড়ালটা আর ও বাড়িতে ভয়ে যাচ্ছে না। আগ্রহ বেড়ে গেল চতুর্গুণ—কিসের ভয়?

খোঁজ নিতে শুরু করলাম, নিধুবাবুর ফেসবুকে কবিতা পোস্টএর সাথে আমাদের হুলোবেড়াল ও বাড়িতে না যাওয়ার সম্পর্কটা কি।

যখন জানলাম তখন হাসি আর থামে না। একা একা ঘরের মধ্যে হাসতে হাসতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছি, এমন সময় পাশের ঘর থেকে ছেলের বৌ ওর শাশুড়িকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল হুড়মুড়িয়ে। ওরা নির্ঘাত ভাবল আমি পাগল হয়ে গেছি। অবশ্য ওরা সময়মতো হস্তক্ষেপ না করলে আমি হয়ত পাগল হয়েই যেতাম। ছেলের বৌ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, কেন এমন করছেন? কি হয়েছে আপনার? এত হাসছেন কেন? কোনো কষ্ট হচ্ছে আপনার?'

ওরা দুজনে ধরাধরি করে আমাকে বিছানায় শুয়ে দিল। একজন ডিজিটাল প্রেসার মেশিনে আমার প্রেসার দেখতে লাগল। আর একজন আমার কপালে হাত দিয়ে নিজের কপালের দোষ খুঁজতে লাগল।

আমি ওদের শান্ত করে বললাম, 'আমার কিচ্ছু হয়নি। আমি ঠিক আছি। ভালো আছি।'

ছেলের বৌ ওর শাশুড়িকে পাশে ঠেলে দিয়ে নিজে সামনে এসে আমার কপালে হাত দিয়ে বলল, 'বাবা, তবে একা একা অমন করে হাসছিলেন কেন?

আর দেখতে পেলাম আপনি হাসতে হাসতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছেন। নিশ্চয়ই আপনার ব্রেনে কোনো গন্ডগোল দেখা দিয়েছে।'

আমি আবার হাসতে লাগলাম। সে কি হাসি! একেবারে অন্যরকম হাসি।

একপ্রস্থ কান্নাকাটি আর উৎকণ্ঠার পর সব স্তিমিত হলে ওদের আসল কথা বললাম। এবার ওরা দুজনেই হেসে আমার মত লুটোপুটি খেতে লাগল। আমাদের বেড়ালটা একবার আমার খাটে উঠছে আর একবার মেঝেতে নেমে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তবে এটা প্রায় নিশ্চিত আমাদের বেড়ালটা আর পাশের বাড়ি যাবে না। রোজ রোজ কবিতা শুনতে কার ভালো লাগে বলুন?

পাশের বাড়ির নিধুবাবুর স্ত্রী রমলা বৌদির সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার একটু আধটু মোবাইলে কথা হয়। রমলা বৌদি আমাকে সেদিন বলল আসল কথা। সেই সঙ্গে এও বলল, 'ঠাকুর পো, আপনি যেন একথা আপনার দাদাকে এমনকি পাড়ার আর কাউকে একদম বলবেন না। তাহলে এই করোনার মধ্যে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে বাড়িতে।'

আমি আস্বস্ত করলাম, 'বৌদি, আপনি বলুন। কথা দিচ্ছি আমি কাউকে বলব না।' মেয়েদের যা হয় তারা কোনো কথা পেটে রাখতে পারে না।

এ কাহিনী আমি বিনোদিনীকে মোবাইলে পরশু সন্ধ্যায় বলেছিলাম। ওদের বাড়িতেও নাকি ওরা দুজনেই সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে দু'দিন ধরে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি পাঠক বন্ধুরা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ব্যাপারটি কি তা জানার জন্য। পাঠকদের অতি সংক্ষেপে বলছি। তবে আপনারাও কাউকে বলবেন না কথাটা। আমি যে রমলা বৌদিকে কথা দিয়েছি, 'কাউকে বলব না।'

অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বলে ফেলি না হলে আমি আবার হাসতে শুরু করব। আর এবার হাসতে শুরু করলে আমার ছেলে আমাকে এই করোনার মধ্যেও ঠিক রেললাইনের ওপারে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ গৌতম সাহার কাছে নিয়ে যাবে।

বেশ কিছুদিন হল নিধুবাবুর এক ফেসবুক ফ্রেন্ড ইরিনা মিত্র আজকাল ফেসবুকে কবিতা পোস্ট করছেন। তাই দেখে নিধুবাবুর ইচ্ছে হল তিনিও ফেসবুকে কবিতা দেবেন। ব্যাস শুরু হল কবিতা লেখা। কিন্তু কবিতাটি ভালো হচ্ছে না মন্দ হচ্ছে একটুখানি যাচাই করে নিতে চান নিধুবাবু।

রমলা বৌদিকে ডেকে নেন আর সামনে বসিয়ে কবিতা শোনান। সেই কবিতা পরদিন ইরিনা মিত্রকে ফেসবুকে ট্যাগ করেন। খাটে বসে নিধুবাবু কবিতা পড়েন। বৌদি ঘরের মেঝেতে বসে আটা মাখেন আর কবিতা শোনেন। বৌদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইরিনা মিত্রর জন্যে লেখা কবিতা দু'চার দিন শুনলেন। সেদিন বুদ্ধি করে একবাটি দুধ মেঝেতে রেখে আমাদের বেড়ালটিকে বসিয়ে চুপিসারে বৌদি রান্নাঘরে

সরে পড়লেন। বেড়ালটি চুকচুক করে দুধ খায় আর নিধুবাবুর কবিতা শোনে। নিধুবাবু একমনে ইরিনা মিত্রর জন্যে কবিতা পড়ে যান।

বেড়ালের দিকে খেয়াল করেন না। রাতের বেলা নিধুবাবু রমলা বৌদিকে জিজ্ঞেস করেন, 'কবিতাটি কেমন হয়েছে, রমলা?'

'খুব ভালো হয়েছে।'—বলে বৌদি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন।

এদিন যথারীতি আবার কবিতা শোনার ডাক এল। বৌদি দুধ নিয়ে এঘর ওঘর বেড়ালটিকে খুঁজছেন, কিন্তু বেড়ালটিকে দেখতে পাচ্ছেন না কোথাও। কাজকর্ম ফেলে বৌদি শুধু বেড়ালের খোঁজ করছেন। কাজের মাসি রমলা বৌদিকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বৌদি, কবিতা শোনার ভয়ে ওই বাড়ির হুলো বেড়াল পালিয়েছে। ও আর আপনার দুধ খেতে আসবে না। আমার মনে হয় আমাদের বাড়ি ও আর কোনোদিনই আসবে না, বৌদি।'

সর্বশেষ খবর—

কবিতা শোনার ভয়ে রমলা বৌদি একমাস হয়ে গেল দুর্গাপুরে ওর বাপের বাড়িতে আছে।

মোহনায় অনুভব

নীতু খানিক আগেই চলে এসেছে ঋকদের বাড়িতে। ঋকের কত বন্ধু আসছে ওর জন্মদিনের পার্টিতে। বন্ধুরা আসছে নানান সাজে, রংবাহারি নানান পোশাকে। সারা বাড়িতে ঝোলানো রঙিন বেলুন, দেয়ালে লাগানো কাগজের ফুল, খাবার টেবিলে কত শত মিষ্টি। নীতুর মিষ্টি খুব পছন্দ। আজ প্রাণ ভরে দুই হাতে মিষ্টি খাবে। বড়ো একটা কেক আর রঙিন মোমবাতি ঘরের মধ্যিখানের টেবিলে।

ঋকের মা বলেছে, 'নীতু, তোর যা মন চায় খাবি। কোনো লজ্জা করবি না।'

ও দিকে রয়েছে আইসক্রিম। সেটাও খাবে নীতু। অনেকদিন পর আইসক্রিম খাবে আজ। রাতে বাড়ি যাওয়ার সময় ঋকের ঘর থেকে দুটো বেলুন খুলে নিয়ে যাবে, ছোটো ভাইকে দেবে।

ছোটোবেলায় ওর মা চলে গেছে ভাইয়ের জন্ম দিতে গিয়ে। হাসপাতালের বিছানায় মায়ের শান্ত নিথর দেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা—মনে পড়ে আজও। সেই থেকে ছোটো ভাই, বাবা আর ও, এই মিলে তিনজনের সংসার।

কাল বিকেলে রাস্তায় তাকে দেখে ঋকের মা বলেছিল, 'নীতু, কাল আমার ঋকের জন্মদিন। তুই আসিস। আর শোন কোনো গিফট আনতে হবে না, কোন কিছু কিনতে হবে না। তোরা কত গরিব আমি তা জানি।'

ঋকদের ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছে নীতু। ওর ইচ্ছে করে ঋকের বন্ধুদের মতন করে কথা বলতে, ওরও ইচ্ছে করে ওদের মতন আনন্দ করতে । নীতু পারে না। দূরত্বটা বুঝতে শিখেছে ও।

ওর একটু রাগও হচ্ছে। ঋকের মেয়ে বন্ধুগুলোর কেউ ঋককে জড়িয়ে ধরছে, কেউ গল্প করছে, কেউ হাসতে হাসতে ঢলে পড়ছে।

নীতু ভাবে, 'ও পারবেই না এমন করে ওদের মতন করতে।'

কতবার ও দেখেছে ঋককে। পাশাপাশি বাড়ি ওদের। আজ যেন ঋক অন্য রকম। কি সুন্দর লাগছে ওকে। ঠিক রাজপুত্তুরের মতন। আর আমি তো এক অতি সাধারণ—ভাবতে থাকে নীতু।

সকলে কেক কাটল, ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভাল, আর জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। সবাই মিলে ঋককে কেক খাইয়ে দিল। কেউ মুখে কেকের মাখন লাগিয়ে দিল দুষ্টুমি করে। ঋক ওর মা'কেও এক টুকরো কেক খাইয়ে দিল।

ছোটোবেলায় মাকে হারিয়েছে নীতু। মায়ের মুখটা এখন আর মনে পড়ে না।

নীতুর দূর থেকে দাঁড়িয়েও হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল ওদের মতন। সঙ্কোচে তাও পারল না। খুব ইচ্ছে করছিল সেও ঋকের মুখে এক টুকরো কেক তুলে দেয়।

—ধ্যাৎ তাই কি হয়! ভাবতেই নীতুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

চুপ করে দেখতে থাকে ঋককে আর ওর বন্ধুদের।

সকলে পাশের ঘরে চলে গেল একসময়। নীতু আস্তে আস্তে টেবিলে রাখা কেকের কাছে যায়। অনেকটা কেক রয়ে গেছে। কোন কিছু খেতে মন চাইল না নীতুর। ভাবল বাড়িতে বাবা আছে। বাবার জন্য একটু কেক নিয়ে যাবে। এরা তো কেউ আর খাবে না। নষ্টই হবে হয়তো। কোথা থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট খুঁজে পেল সে। কিছুটা কেক তুলে নিল সে আর প্যাকেটে ভরে নিল। কেমন একটু লজ্জাও করছিল তার।

বাবার মুখে আজ নিজ হাতে কেক খাওয়াবে, যেমন ঋক ওর মা'কে খাওয়ালো।

প্লাস্টিকের ব্যাগটা জামার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ঋকদের ঘর ছেড়ে যেই বারান্দায় পা রেখেছে, তখনই সামনে ঋকের মা। হঠাৎ করে নীতুর মুখের সকল আলো নিভে গেল।

নীতু দাঁড়িয়ে পড়ল বারান্দাতেই। কি করবে বুঝতে পারছে না। ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে লাগল নীতু।

ঋকের মা নীতুর হাতটা ধরতেই জামার ভেতর থেকে কেক সমেত প্লাস্টিকের প্যাকেটটা মেঝেতে পড়ে যায়। ঋকের মা অবাক হয়েই প্যাকেটটা তুলে নেয়। ঋকের বন্ধুরা ততক্ষণে এসে চারপাশে ভিড় জমিয়েছে একে একে।

ঋকের এক বন্ধু বলে ওঠে, 'কাকিমা, মেয়েটা চুরি করেছে বুঝি?'

ঋকের মা সকলকে ইশারায় ভেতরে যেতে বলে। নীতুর হাত ধরে সোজা নিজের শোয়ার ঘরে নিয়ে যায়।

ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। দুজনে কেউ কোনো কথা বলে না।

ঘরটা নীরব হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ঋকের মা বেশকিছু মিষ্টি, অনেকটা কেক আর আইসক্রিম একটা বড়ো প্যাকেটে ভরে নীতুর হাতে দিয়ে শুধু বলল, 'চল।'

নীতুকে নিয়ে দরজার বাইরে এসে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে একা দাঁড়িয়ে ঋক তখনও ওর মাকে দেখছে। আকাশে ততক্ষণে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। আজ শ্রীপঞ্চমী।

নষ্ট পাখির গল্প

ল্যাপটপটা আমার বড়ো সাধের, সখেরও। যত কবিতা আর প্রবন্ধ ওই ল্যাপটপের হার্ডডিস্কে তুলে রাখতাম। বহু চেষ্টায় আর আন্তরিকতায় একটা আপেল বাগান বানালাম বাড়ির লনে—এক বছরের পরিশ্রমে।

একটা শীতলপাটি কিনে আনলাম পূর্বপল্লীর হাট থেকে। আপেল বাগানের নরম ঘাসে পাটি পেতে সেখানে বসে কবিতা গল্প লিখতাম। বাগানের মোলায়েম ছায়া আর কামধেনু বাতাস আমার মন ভরিয়ে রাখত।

আমার কবিতারা আপেল তলায় মাটির গন্ধে লালিত পালিত হতে লাগল। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখল।

একটা হলুদ পাখি আপেলের ডালে এসে বসতে শুরু করল। সে আপেলের ডালে বসে আপন মনে নাচত, কীর্তন গান করত। আমার কবিতাগুলোকে ছায়া দিত।

আমি ওকে নিয়ে কবিতা লিখলাম-

'হলুদপাখি,
হলুদপাখি,
তোকে আমি কোথায় রাখি?'

হলুদ পাখি আহ্লাদে আট খান।

আমার আপেল বাগানে অনেক পাখি আসত আপেল খেতে, নাচতে গাইতে। হলুদ পাখিটি সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে খামচে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিত। ডানায় রক্ত মেখে ওরা অভিসম্পাত দিয়ে চলে যেত।

একদিন ভরদুপুরে কোন খেয়ালে ভাবলাম, যাই আপেল গাছের ছায়ায় গিয়ে একটুখানি বসি।

একি! বাগানের একি হাল! আপেলের গাছগুলো আছে, আপেল নেই কোনো গাছে। গাছের ছায়া নেই। শীতলপাটি পড়ে আছে অগোছালো। তার উপরে কিছু মৃত শেকড়ের স্তুপ হাহাকার করছে। হায়! আমার কবিতারা কোথায়?

একটা নষ্ট আপেল তখনও মাটিতে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে।

হঠাৎ হলুদ পাখিটি কোথা থেকে এসে শেষ আপেলটিও মুখে নিয়ে উড়ে পালাল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'হলুদপাখি, হলুদপাখি, নষ্ট আপেল খাস

না। ওতে সকলের অভিশাপ লেগে আছে। ওতে আছে নীল বিষ। তুইও নষ্ট হয়ে যাবি।' কে শোনে কার কথা। পাখিটি চৈত্রের আগুনে উড়ে গেল।

কবিতার পাতাগুলো খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা হেঁটে নদী তীরে দুর্গা মন্দিরের উঠোনে পৌঁছোলাম।

পুরোহিত আমাকে দেখে বলল, "গত আশ্বিনে আমার দুর্গা বিসর্জনে গেল। আমি কত কাঁদলাম। তুমি বললে, 'তোমার দুর্গা আবার আসবে। কই, সে এসেছে?"

পুরোহিতের হাত দুটি ধরে বললাম, "যে দুর্গা চলে যায় সে দুর্গা আর আসবে না। নতুন খড়, নতুন মাটি আর নতুন রঙ মেখে আসবে তোমার আগামী আশ্বিনের দুর্গা। প্রদীপ জ্বেলে তাকে মন্দিরে তুলো।"

আমি দুর্গা মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম মন্দিরের মেঝেতে দুর্গন্ধ আর অসংখ্য ইঁদুরের গর্ত। মন্দিরগাত্রে ঝুল আর ধুলো। দুর্গার কোনো নামগন্ধ নেই কোথাও।

আমি আর পুরোহিত দুজনে দেয়ালের ঝুল ঝাড়লাম, মেঝেতে কলস ভরে জল ঢাললাম। অযত্নে পড়ে আছে প্রদীপখানি। প্রদীপের ধুলো তেল ময়লা ধুয়ে মুছে বেদিতে বসালাম। ধুপ জ্বালিয়ে পবিত্র করলাম মন্দির চৌহদ্দি। দীঘির জলে স্নান করে পবিত্র হলাম। পুরোনো বসন ত্যাগ করলাম দীঘির ঘাটে। শুচি শুভ্র বসনে আমরা দুজন এসে বসলাম মন্দিরের সামনের বাঁশ আর কঞ্চির বেঞ্চিতে।

পুরোহিত আমাকে অনুনয় করে বলল, 'লেখক, এখন থেকে এই মন্দিরে এসে বসো। একটা নতুন ল্যাপটপ কিনে এনো। অনেক তো কবিতা হলো, এবার একটা ছোটোগল্পের বই লেখো এই বেঞ্চিতে বসে। আমার অনেক নষ্টপাখির গল্প আছে ঠিক তোমারই মতো।

চন্দ্রকান্ত ও প্রজাপতি

রবিবার বিকেলে আমার বাগানে মৃত্তিকা চন্দ্রকান্তকে বলেছিল, 'কবিতা মানে কিছু ন্যাকান্যাকা কথা। কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে?'

আমি মৃত্তিকার হাত থেকে চন্দ্রকান্তর কবিতার বইটি নিয়ে বললাম, 'তুই যে চন্দ্রকান্তকে ভালোবাসিস এটাতো তাহলে আরও বড়ো ন্যাকামো।'

চন্দ্রকান্ত শুধুই হাসল। চন্দ্রকান্ত ভালোই জানে তর্ক করার চেয়ে শুধু হাসি অনেক বেশি প্রতিবাদী, অনেক বেশি জোরাল।

মৃত্তিকা আমার হাত থেকে বইখানা ছিনিয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বলল, 'আমার প্রেমকে ন্যাকামো বলবেন না, প্লিজ। ও যাই লিখুক না কেন, ওকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। আমি ওর রঙিন প্রজাপতি।'

এবার আমি খুব জোরে জোরে হাসলাম। জোরে হাসলে প্রতিবাদ থাকে না, থাকে একটা উপভোগ। সেটা মৃত্তিকা অন্তত বুঝেছে।

গতকাল সাউথ সিটি মল থেকে কিছু কেনাকাটা সেরে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখি মৃত্তিকা। ওর হাতে শপিংয়ের ব্যাগ।

'কিরে মৃত্তিকা? কতোদিন পর দেখা। একা এসেছিস?' মৃত্তিকাকে বললাম।

'হ্যা একাই বলতে পারেন।'

'কেন? চন্দ্রকান্ত? সে আসেনি?'

'সে কোথায়, আর আমি কোথায়! চন্দ্রকান্ত এখন আর কবিতা লেখে না। কি একটা চাকরি করে শুনেছি।'

'সে কি রে। তোরা বিয়ে করিস নি? এতো ভালোবাসতি তাকে?'

মৃত্তিকা খুব হাসল, 'কি যে বলেন—এটা সত্য যুগ নাকি! ভালোবাসলে বিয়ে করতে হবে এমন মাথার দিব্বি আপনাকে কে দিল?'

বলে সামনের কফিশপে ঢুকে মাঝারি বয়সী এক ভদ্রলোকের হাত ধরে বেরিয়ে আসল। ওরা দুজন সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। পেছন থেকে মৃত্তিকাকে রঙিন প্রজাপতির মত দেখাচ্ছিল।

আমি অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা কবিতার লাইন খুঁজছিলাম।

ইন্দুমতী ও চৈতন্য

চৈতন্য ইন্দুমতীকে স্পর্শ করল না। দূরে সরে বলল, 'না রে, আমি মানুষটা ভালো না। তুই আর আসিস না আমার কাঁটাবনে।'

ইন্দুমতি কোনো প্রশ্ন করল না চৈতন্যকে। চৈতন্যও কোনো কারণ দর্শাল না। ভাবলেশহীন চেয়ে থাকল পথের দিকে। ইন্দুমতী পথের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল না। ইন্দুমতী চৈতন্যর দিকে একপা এগিয়ে বলল, 'আমার সরলতা আমার দুর্বলতা নয়, চৈতন্য। আকাশ থেকে এখনও অনেক প্রশ্ন ঝুলে আছে তোমার চোখের সামনে, এড়িয়ে যেতে পারবে না একটিও।'

এক ঝাঁক সান্ধ্যপাখি নিঃশব্দ অন্ধকারে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে ।

ওরা কেউ মঙ্গলকাব্য পড়েনি, তাই কে বুঝিয়ে দেবে, 'চৈতন্য, তুমি ভুল বললে?' ওরা কেউ জানে না—শরশয্যায়ও সুখনিদ্রা দেওয়া যায়, রক্ত ঝরে না এক ফোঁটাও। যখন খঞ্জনি বাজিয়ে ওরা দু'জন পথে নামত খালি পায়ে, তখন ওরা ঠিক জানত মনের আগুনে কতটা সুখ কতটা মমতা। মীরাবাঈ তার প্রিয় ভজনগানের সময়ও মেবারের রাজা রানা কুম্ভকে মনের আড়াল করতেন না।

এসব টুকরো টুকরো জলতরঙ্গ শুনলে কি এত তাড়াতাড়ি বিরহ-বিচ্ছেদের মত ক্যাসেন্দ্রা ক্রসিংয়ের জংধরা রেলগাড়িতে উঠে পড়ে ইন্দুমতী? না হারালে বোঝা যায় না, কি হারালাম। ইন্দুমতী সবে বুঝতে শুরু করেছে চৈতন্য তার কুঞ্জবনের কতখানি। ইন্দুমতী বুঝতে শুরু করেছে চৈতন্য তার দেহের কতটা জ্বালা।

নিজেই নিজেকে আঘাত করছে, 'সামান্য জেদের পেয়ালা উপেক্ষা করতে পারলি না? কিসের এত তাড়না? কিসের এত তাড়া? পুরুষই তো পথভ্রষ্ট হয়। নারীই তো ক্ষমা করে।'

চৈতন্যের অন্দরে এখন গভীর শূন্যতা, সে খবর জনে জনে জেনে গেছে। হলুদ তোতাপাখিটি যেদিনই জানতে পারল খবরটা, সময় নষ্ট করেনি আর। পাড়ার সকলে লক্ষ্য করেছে। চৈতন্যর ঘরে খঞ্জনীর আওয়াজ। চৈতন্যের টিনের চালে একটা তোতাপাখির আনাগোনা বেড়েছে কয়েকটা দিন- এ কথা এখন মুখে মুখে।

রাতের বেলা কে যেন সুর করে বলতে বলতে গেল, 'দেবালয় কি শূন্য থাকে?'

ইন্দুমতী অভিমান করে বলেছে, 'আমার গহীনে যে দেবালয় সেখানে আর কোনো পুরুষের ঠাঁই হবে না।' একটি পুরুষ সেদিন শুনে ফেলেছিল কথাটা। ইন্দুমতীকে অনুসরণ করতে থাকে। দেবালয় শূন্য থাকল না। ইন্দুমতী ঘরের বারান্দায় দাঁড়াল। হাত দুটি এগিয়ে দিল পুরুষটির দিকে আর আলতো করে টেনে নিল ঘরের অন্তরে, মনের অন্দরে। ওরা দুটিতে বেশ আছে। ইদানিং হাসে গায়। এক শয্যায় বসত করে।

কাত্যায়নী

পাশের বাড়ির ছাদে, তেমাথার মোড়ে অথবা রঙীলা বাসস্টপেজে—একই ভীরু যুবক অমিত। কাত্যায়নী ধমক দেয় একদিন, 'এই ছেলে, তুই জানিস, আমি তোর চেয়ে ছয় বছরের বড়ো? এখন থেকে মনে রাখিস কথাটা।'

অমিত ক্ষমা চেয়েছিল দূরে দাঁড়িয়ে।

পাশে বসিয়ে কেউ ক্ষমা করতে পারে না। করুণা করা যেতে পারে বড়োজোর।

সামনে বসিয়ে কেউ ভালোবাসার কথা বলতে পারে না। মুখোমুখি বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভ্রমণ হতে পারে বড়োজোর।

এমনি করে চোখের আড়ালে বয়স বাড়ে পৃথিবীর। সূর্যাস্তে বার্ধক্য বাড়ে চটুল সে অহংকারী রমনীর। বলিরেখা যখন কপাল ছেড়ে বুক বেয়ে নামতে থাকে শরীরে, ভাবতে বসে, 'কি পাইনি।'

মান্যবর,

অপরাধ নেবেন না পাশের বাড়ির যুবকের বাড়ন্ত কল্পনায়।

অপরাধ নেবেন না অপরাহ্ন নারীর ক্রমশঃ লজ্জা হারানো জল্পনায়।

পুড়ে ছাই হয় বিবাহিত প্রেমিকের ব্যর্থ দলিল। সংসারে মন দিয়েছে হতচ্ছাড়া।

পুরোনো বাসমতী চালের সুগন্ধের মতো ভালোবাসার চিঠি হাতে কাত্যায়নী দাঁড়িয়ে থাকে নির্জন মোড়ে। পাশের বাড়ির কম বয়সী যুবক যদি এসে বলে, 'চলো পালাই। পুরো পৃথিবী নিষ্পাপ!'

পালক, ফুল ও মাটি

নিজেকে খুব হালকা লাগছে। কারণটা জানি না। অনেকেরই নাকি এমন হয়—কারণ ছাড়া হঠাৎ হালকা বোধ হওয়া। কেমন যেন ভারমুক্ত এক একলা রাজর্ষি আমি। মনে হচ্ছে যেন আমি পাখির এক সাদা পালক। বাতাসে উড়ছি। ভুল বললাম, বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, নাচিয়ে নিয়ে চলেছে ওর খুশিমতো। এধার থেকে ওধার, যেন দায়হীন ভাবনাবিহীন ফিনফিনে চিকন ভায়োলিন। বাতাসেরই এমন একটা সাধ থাকে, এমন ধৈর্যও থাকে।

ঘাসের ডগার উপরে পালকখনি একসময় বিশ্রামে বসল, আমিও যেমন চেয়ার পেতে দিনশেষে ভাবতে বসি বারান্দায়।

দোতলায় আমার ঘরের লাগোয়া সে বারান্দা। পাশে হালকা মেজাজে পুরোনো স্ট্যান্ডফ্যান যেন দারোয়ানের হাতে স্যাক্সোফোন। পায়ের কাছে সাদা বেড়ালটা চুপ করে বসে থাকে যেন পুরো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আমার পায়ের কাছে বসে আছে উবু হয়ে।

ভাবছি বসে, কোনো পাখির হালকা সাদা পালক হয়ে বাতাসে নাচতে কার না ভালো লাগে। ভাবতে ভাবতে বারান্দা ছাড়িয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকালাম। রাস্তার পাশে কিছু অগোছালো ঘাস গজিয়েছে। আমি তার দিকে নিবিষ্ট হলাম। দেখতে পেলাম আমারই মতো একটা সদ্য ভেসে আসা সাদা পালক সেই ঘাসের বিশ্রামে।

বলে উঠলাম, 'ওহে পালক, তোমার জন্ম কোথায়, কোন সুদূরে, কোন ক্ষণে?

কেউ কি জানে, কোন পাখিটির মরণ গাথায় তুমি ছিন্ন এ পালক?'

ভাবতে থাকি—

এ কোন নিহত পাখির আত্মরতির গল্প?

কোন কিশোরী হাতে তুলে নেয় চিকন ভায়োলিন?

তখনও অমল বলছে, 'দাদা, অহঙ্কারী পুরুষ নিরীহ পাখি শিকার করে বীরত্ব প্রকাশ করে। পালক, সে ঘাসের বুকেই সমাধি রচনা করে।'

আজও আমি কি জানলাম—

রক্তমাখা পাখিটির ডানা থেকে কেন নিষ্পাপ কিশোরী একটি পালক তুলে নিয়েছিল?

ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা ডেকে আনি স'মুখের রাস্তায়, সেখান থেকে সব বাধা অতিক্রম করে সোজা আমার একান্ত বারান্দায়।

সন্ধ্যা ক্রমেই অন্ধকার হল। আমি চেয়ার ছাড়লাম না।

শুনতে পেলাম পালক রাস্তার পাশের ঘাসকে বলছে, 'একদিন তুমি আর আমি মাটিতে মিশে মাটি হব। একদিন একটা ফুল হব। কিশোরীরা ফুল ছেঁড়ে না। অমলদাও না।'

নারীর অপর নাম মৃত্তিকা

ইন্দিরা মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলেছিল।

রজত বলেছিল, 'সেই সিজার, যে সাজানো প্রলোভন থেকে ঠিক সময়ে হাত গুটিয়ে নিতে জানে।'

রজতকে বললাম, 'তাই বলে ইন্দিরার মোবাইল ফোন ভাঙাকেও বলছ, সঠিক?'

'হ্যাঁ, ও মোবাইল ফোন ভেঙে ওর সকল দুঃখ মাটিতে আছড়ে ফেলতে পেরেছে। সকল স্মৃতি মাটিই শুষে নিয়ে মন হালকা করে। সকলের সকল সুখ মাটি ধরে রাখতে পারে যথাসময়ে ফিরিয়ে দেবে বলে।'

এভাবেই আমরা সারাজীবন কাটাকুটি খেলা খেলে চলেছি জীবনটা নিয়ে। রজত খেপে গিয়ে বলল, 'তাই বলে আমি ভূমিহীন কবিদের সাবাস দিতে রাজি নই।'

'কেন কেন? ওদের আবার কি দোষ?'

'কয়েকটা দুর্বোধ্য শব্দ বসালেই আধুনিক কবিতা? যে লেখে সেও জানে না সে কি লিখেছে। ইন্দিরা না বুঝে ওদের হাততালি দেয়। এটা আমার অসহ্য।'

-'এমন তো হতে পারে তুমি কবি মন বুঝতে পারোনি। সে দোষ তোমার।' রাগটাকে পকেটে পুরে রজত এবার হাসল।

আমি বলে চললাম, 'এই যে তুমি বললে ইন্দিরা মোবাইল ফোন ভেঙে ভালো করেছে। এমন তো হতে পারে সে তোমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারছে না? সে তোমার ভালোবাসাকে ভাবছে করুণা অথবা অবহেলা?'

'কিন্তু বাবুমশাই, আমি তো জানি, ইন্দিরা আমার কবিতাকে সহ্য করতে পারছে না। এক সময় আমার কবিতা শুনে আমার কাছে এসেছিল। এখন আমার কবিতা ওর হিংসা। আমি যে কোনোটাই ছাড়তে পারব না। না কবিতা না ইন্দিরা।'

'কিন্তু আমি তো দেখেছি ওর বন্ধুদের মাঝে তোমার কবিতা নিয়ে গর্ব করতে।'

'এটাই তো মানুষ মনের আদিম সংস্করণ। বাইরে যেটা গর্ব ভেতরে সেটা বিতৃষ্ণা। যতবার ওকে বলেছি—আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দেব, ততবার ও আমার হাত চেপে ধরেছে আর বলেছে, না না ছেড়ো না।'

'ইন্দিরা তোমার জন্যেই স্নেহাশীষের নাচের দল ছেড়ে বেরিয়ে আসল, স্নেহাশীষকেও ছেড়ে দিল। তুমি সেই আনন্দে ওকে নিয়ে গোয়া বেড়াতে গেলে।

একবারও কি বলেছিলে—ইন্দিরা, নাচ ছেড়ো না? একবারও কি বলেছিলে, স্নেহাশীষ তোমার বন্ধু? বলোনি।'

না থেমে বলে চললাম, 'আমরা পুরুষরা পুরুষই রয়ে গেলাম। একচুলও নড়িনি।'

আজ সকালে ইন্দিরা আমাকে ফোন করে বলল, 'বাবু মশাই, রজত আমাকে কাল একটা দামি মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছে।'

বুঝতে পারলাম ইন্দিরা কেন খুশিতে ডগমগ।

না হলে গাছের সব পাতা ঝরে যেত।

বুঝতে পারলাম কেন নারীর অপর নাম মৃত্তিকা।

নাহলে সব পুরুষ আশ্রয়হীন হয়ে যেত।

স্পেস

'তুমিই আমার শেষ প্রিয়তমা'—রঞ্জন সুদীপাকে বলতেই ভুরু কুঞ্চিত করেছিল পাশে দাঁড়ানো বিরূপাক্ষ। বলে উঠল, 'এ কি অন্যায়? এ যে হেয়ার স্টাইল পাল্টানোর মতো কারসাজি।'

আমি বিরূপাক্ষকে বললাম, 'ঘাবড়িও না। এটা রঞ্জনের শেষের কবিতা নয়। শীতের শেষে ও মানস সরোবরে আবার যাবেই এবং আর একটা লাল পদ্ম তুলে আনবে।'

সামার ভ্যাকেশনে লন্ডনের 'জাঙ্গল গার্ল কফি শপ'এ আমরা আড্ডায় তখন। তিনজনে একটা টেবিল নিয়েছিলাম আগলি কর্ণারে।

আমার সামনেই রবার্ট এলিনাকে বলেছিল, 'তুমিই আমার শেষ স্ত্রী।'

আমিও রঞ্জনের মতো একটা স্কেচ এঁকেছিলাম তখন। রবার্ট উঠে গেলে এলিনাকে বলেছিলাম, 'দেখো এলিনা, আকাশ কখনও কথা বলে না কিন্তু এক আকাশ ভাবনা নিয়ে আকাশ সারারাত জেগে থাকে।'

এলিনা দেরি না করেই বলল, 'জেনে রাখো, আমি রবার্টকে তোমার কথা কিছু না বললেও ও আমাদের রসায়নটা সব বোঝে। বুঝেও আমাকে স্পেস দেয় রবার্ট।'

আমি ওর হাতে একটা চাপ দিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'কিচ্ছু বলো না। কি দরকার? ডুমুরের ফুলকে আলো দেখালেই বিপত্তি। সব ঘরে একটিই তো নিজস্ব জানলা।'

কাল রাতে টিভিতে নির্বাচনের এগজিট পোল দেখছি তখন ফোন করে সুদীপা জানাল, 'কাল বিকেলে রবীন্দ্র সদনে কবিতা বাসর আছে। চলে এসো।'

'দেখো সুদীপা, আমি তোমার আবৃত্তি পছন্দ করি, কিন্তু রবীন্দ্রসদনটাই শেষ কথা নয়। তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরবে রঞ্জনই তোমার জন্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে ডাইনিং টেবিলে অপেক্ষা করবে।'

'অত ভেবো না। রঞ্জন আমাদের কবিতা ক্লাসিকটা জানে। আমাকে স্পেস দেয় রঞ্জন।'

-সমাপ্ত-